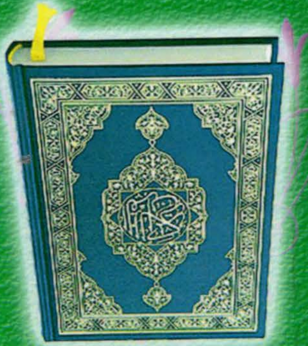
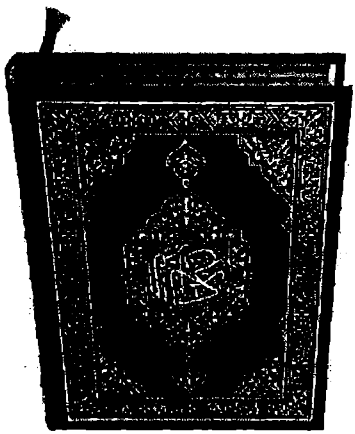
কলকাতা হাইকোর্টে কোরাণ মামলা



অমলেশ মিশ্র



কলকাতা হাইকোর্টে কোরাণ মামলা



অমলেশ মিশ্র

Kolkata Highcourt-a Koran Mamla
by Amalesh Mishra

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
অমলেশ মিশ্র,
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ৪০১

প্রকাশক ঃ
অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

সংস্করণ ঃ
২৫শে অক্টোবর, ২০১৪
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

লেখক ঃ
অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

অক্ষর বিন্যাস ঃ
তপন কুমার সাউ
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৮২৪০৫৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
প্রকাশক, কাঁথি

মূল্য ঃ
৬০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার একান্ত প্রিয়
স্বর্গত বাবা শ্রী রজনী কান্ত মিশ্র
এবং
স্বর্গতা মা - শ্রীমতী প্রতিভা রাণী মিশ্র
কে
পরম শ্রদ্ধায় এই পুস্তক উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে, সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৮ বছর বয়স্ক হলেই ভোটার হওয়া যায়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় যে প্রার্থী সর্বাধিক ভোটারের সমর্থন পান তিনি জন প্রতিনিধি হয়ে যান। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে। নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলের বেশী প্রার্থী জয়ী হন, সেই দল সরকার গঠন করে। কখনও কখনও একাধিক দল একত্রিত হয়েও সরকার গঠন করতে পারে। একটি সরকারের কার্য্যকাল সাধারণত ৫ বছর।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে, হিন্দু জাতির লোকসংখ্যা বেশী এবং সেই কারণে ভোটার সংখ্যা বেশী। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম সে কারণে ভোটার সংখ্যা কম। সারা দেশে হিন্দু ভোটার সংখ্যা যদি ১০০ র মধ্যে ৭৫ হয়, মুসলমান ভোটার সংখ্যা ১০০র মধ্যে ২৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মুসলমান ভোটার সংখ্যা অনেক বেশী। ১০০ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৩৪ জন মুসলমান ভোটার। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে প্রায় ৬৪-৬৮ টি আসনে মুসলমান ভোটাররাই নির্ণায়ক ভূমিকায়।

হিন্দু জাতির লোক এবং ভোটার সংখ্যা বেশী হলেও তারা অনেকগুলি ছোট বড় দলে বিভক্ত। ঐ ৭৫টি ভোট অনেক জনে বিভক্ত হয়। কেউ পায় ২৫, কেউ ২০, কেউ ১০, কেউ ৫ অর্থাৎ কেবলমাত্র হিন্দু ভোটে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না যেহেতু ঐ ভোট বহু ভাগে বিভক্ত হয়।

অপরদিকে মুসলমান ভোট খুবই সংঘবদ্ধ। ২৫টি ভোটের ২০ হয়ত একটি দল পেল, ৫টি ভোট এদিক ওদিক চলে গেল। ঐ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হল যেখানে বা যে দেশে তারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত ভাবে কম, সেখানে বা সেই দেশে তারা খুব ঐক্যবদ্ধ থাকে। ফলে তাদের ভোটের ভাগাভাগি কম হয়। তবে কেন ঐক্যবদ্ধ থাকে তার কারণ গভীর এবং পৃথক। এই পুস্তিতায় তা আলোচ্য নয়।

হিন্দু জাতি প্রভাবিত রাজনৈতিক দলগুলি জানে যেহেতু হিন্দু ভোট

বিভক্ত তাই তাদের উপর বেশী নির্ভর করা যায় না। হিন্দু ভোট হল ঘরকা মুরগী তাই ডাল বরাবর। ক্ষমতায় বা সরকারে যেতে গেলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ ভোট একান্ত প্রয়োজন।

ঠিক এই সূত্র থেকেই, আমাদের দেশ ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে, ক্ষমতা পিয়াসী এবং ক্ষমতা দখলকারী দলগুলি অনেক বেশী সুবিধা দেয়। এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারটাকে আমরা বলি তোয়াজ করা বা তোষণ করা। এই কারণেই এই দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারল না। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নাগরিক মাত্রেরই সমান অধিকার থাকে। বিশেষ অধিকার থাকে না, বিশেষ সুযোগ থাকে না। কোন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র - হজ্ করতে যাওয়ার জন্য অনুদান দেয় না বা দেশের আইন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের জন্য বিশেষ আইন মানে না বা ইমাম মোয়াজ্জিমদের ভাতা দেয় না।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটাররা ঐক্যবদ্ধ থাকেন সম্প্রদায়গত (ধর্মগত) কারণে। তারা হিন্দু প্রভাবিত রাজনৈতিক দলগুলির দুর্বলতা বোঝেন এবং জানেন তাই তাঁরা লক্ষ্য রাখেন (১) কোন দল ক্ষমতায় গেলে সম্প্রদায়গত ভাবে তারা বেশী সুবিধা পাবেন, (২) কোন দলের সরকার গঠন বা ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দুইটি দিকে নজর দিয়ে তারা তাদের ঐক্যবদ্ধ ভোট-এর দিক নির্দেশ দেন। সাধারণত ঐ সম্প্রদায়ের নেতারাই এই বিষয়টি স্থির করেন। কোন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা বিষয়টি স্থির করেন না। স্থির করেন ধর্মীয় নেতারা। লক্ষ্যণীয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমস্ত দলের মুসলমান জনপ্রতিনিধিরা একই সুরে কথা বলেন। অথচ হিন্দু জাতির স্বার্থ বিষয়ক কোন বিষয়ে সব দলের হিন্দু প্রতিনিধিরা এক সুরে কথা বলেন না। অথচ দেশটা হিন্দু জাতি প্রধান। এদেশের জাতীয়তা হিন্দু, এদেশের সংস্কৃতিও হিন্দু। এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু কর্তৃত্ব মানবেন না বলেই নিজেদের জন্য পৃথক রাজ্য চেয়েছিলেন, পেয়েছেনও।

মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ভাল করে জানতে হলে কোরাণ এবং হাদিশ পড়া ও বোঝা দরকার। আমাদের দেশের নেতারা মনে হয়, না পড়েন হিন্দু শাস্ত্র, না পড়েন ইসলাম শাস্ত্র। তাই তারা যা খুশী বলেন - যা বললে তাদের ক্ষমতা ভোগের কোন ব্যাঘাত না হয়। দেশ বা জাতির ক্ষতি তারা বিশেষ গুরুত্ব দেন বলে মনে হয় না।

তাদের সামনেই তারা দেখছেন যে দিল্লীর সংসদ ভবনেই হোক বা

বর্ধমানেই হোক, যারা সন্ত্রাস করেছে তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তবু তারা বলেন যে - সন্ত্রাসবাদীর কোন ধর্ম নাই। যেন তারা সব ধর্ম পড়ে নিয়েছেন। আবার এরাই দারা সিং-এর সঙ্গে এক খৃষ্টান পাদরীর গন্ডগোলে দারা সিংকে বললেন - হিন্দু সন্ত্রাসবাদী অর্থাৎ তারা বলতে চান - সন্ত্রাসবাদী যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের হয় তখন বলতে হবে - সন্ত্রাসবাদীর কোন ধর্ম নাই। আর কোন হিন্দু জাতির লোক - খৃষ্টান বা মুসলমানের বিরুদ্ধে কিছু করে, তখন তার জাত আছে, সে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী।

বোঝাই যাচ্ছে - (১) তারা ঐক্যবদ্ধ মুসলমান ভোটের লোভে মুসলমানদের করা সন্ত্রাসকে লঘু করে দিতে চান, তাদের।এই এই সন্ত্রাসবাদের উৎস কোথায়, তা জানার কোন সদিচ্ছাও এদের নাই। (২) তারা হিন্দু শাস্ত্র, খৃষ্টান শাস্ত্র এবং ইসলাম শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নন। (৩) যা বললে এবং করলে ক্ষমতা ভোগের ব্যাঘাত হবে না, তাই-ই বলবেন এবং করবেন।

এই সব ভোট ভিখারীদের নিয়ে দেশ ভাল ভাবে চলে না। হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য কারুরই কোন স্থায়ী উপকার হয় না। এই ধরণের নেতৃত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করা দরকার।

অমলেশ মিশ্র

কলকাতা হাইকোর্টে কোরাণ মামলা

১. মুসলমানদের গর্বের ভিত্তি কোরাণ-হাদিস-মহম্মদ, ২. মহম্মদ ও কোরাণ, ৩. বিষয়বস্তু, ৪. পাঁচটি স্তম্ভ : কলেমা - নামাজ - রোজা - যাকাত - হজ্জ, ৫. আর একটি হেমায়েত-এ ইসলাম কাবাগৃহ, ৬. কুল্লে মুসলেমিন ইখুয়াতুন, ৭. প্রাক্-ইসলামী আরব, ৮. আরবের দেবদেবী, ৯. ইসলাম ও আদালত, ১০. ইন্দু সাঁই শর্মা - হিমাংশু কিশোর চক্রবর্তী, ১১. চাঁদমল চোপড়া, ১২. কয়েকটি টীকা - অংশীবাদ, কলেমা, জাহান্নাম, জান্নতে ইত্যাদি।

ইউরোপীয় ইংরাজরা ভারতে এসে ধরে নিয়েছিল যে এদেশের 'কালাআদমী'দের সভ্য করার দায় তাদেরই। একে বলা হয় - ভারতীয়রা (কালা আদমী) ছিল সাদা চামড়াদের দায়। তবে এর পিছনে তারা কোন ধর্মীয় নির্দেশ নিয়ে আসেনি। এটা ছিল সাদা চামড়ার গর্ব।

মুসলমানরা এদেশে এসে এদের 'সভ্য ও সংস্কৃত' করার দায় নিল। ভারতীয়দের ইসলামী বানানো তাদেরই 'দায়'। এর পিছনে তারা একটি ধর্মীয় আদেশ নিয়ে এল - যেটি তারা তাদের ধর্মপুস্তক থেকে পেয়েছিল। তারা তাদের তরবারী ব্যবহার করল এদেশ থেকে বহুত্ববাদীতা দূর করতে। দেব-দেবীর মূর্তি ও স্থানকে (বুৎপরস্তি) ধ্বংস করে এক আল্লাহয় বিশ্বাস (খোদা পরস্তি) স্থাপন করতে - তারা তরবারীর সঙ্গে আল্লাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে এল। কতদূর কী হয়েছে বা তারা পেরেছে - তা কিছুটা বোঝা গেছে, জানা গেছে।

কিন্তু আধুনিক সময়েও তারা থেমে আছে বলে মনে করার কারণ নাই। তৈলধনী আরব এখন বিশ্ব ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র। বিশ্বে শেষ কথা বলবে ইসলাম। বহু সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তৈরী হয়েছে জিহাদ-এর উদ্দেশ্যে। জিহাদে বাঁচলেও লাভ, মরলেও লাভ। বিশ্বজুড়ে চলছে জেহাদের ছোটখাট ঘটনা। ভারতে বড় কম ঘটেনি। বার হাত কাপড় পরেও উলঙ্গ ভারত সরকার টিভি ফুটেজে কাসভকে বা আফজল গুরুকে সন্ত্রাস করতে দেখেও - বিশ্বাস করে না - দশ বছরে ধরে অপরাধীর বিচার করতে বসে যায়। ভীরুতাকে, বদ্যান্যতা বলে চালাবার এই প্রচেষ্টা তারাই করছেন - যারা যোদ্ধা ভারতবাসীর উত্তরাধিকারী। অথচ যোদ্ধা ভারতবাসীকে চেনেন না।

কানাডায় বসবাসকারী এক ইরানী ভদ্রলোক নাম আলি সিনা একটি বই লিখেছেন। প্রকাশ করেছে Felibri.com নামে আমেরিকার একটি সংস্থা। মূল্য - ৭ ডলার। বইটি পড়ার সুযোগ হল। বইটির নাম Understanding Muhammad। তিনি লিখেছেন সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ থেকে এখন (বইটি ২০০৮ সালে প্রকাশিত) পর্যন্ত ১২০০০ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আহত ও নিহত হয়েছে। যারা এই কাজগুলি করেছে তারা দানব নয়, তারা মুসলমান - যারা তাদের ধর্মকে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে কাজ করে। তারা অসহনশীল, প্রভূত্ব পরায়ণ, আগ্রাসী এবং হিংস্র। তারা অন্যদের নিন্দা করে, অন্যদের অধিকার ও বিশ্বাস স্বীকার করে না। (ঐ পুস্তক ভূমিকা, পৃ. ৬)

রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলেছিলেন যে, মুসলমানরা শুধু নিজেদের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্যদেরটা সংহার করতে চায়।

আলি সিনা ঐ উল্লিখিত পুস্তকে নবী মহম্মদের মানসিক স্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তার মতে নবী মহম্মদের চারিটি অসুখ ছিল - সেগুলি মানসিক - (১) Narcissim, (২) Epilepsy, (৩) Obsessive compulsive disorder, (৪) acromegaly।

এইগুলির বাংলা ডাক্তারবাবুরা বলতে পারবেন, আমি হয়ত ঠিক পারব না। তবে আলি সিনা ঐগুলি মানসিক রোগ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং ঘটনা ও কুর-আনএর বিভিন্ন আয়ত সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রবন্ধে ঐ বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে না। তবে এর সঙ্গে আরও একটি রোগ যাকে Paranoia বলে সেটিরও উল্লেখ করেছেন কয়েকটি আয়তসহ। তাও এখানে আলোচ্য নয়।

কোর-আন এবং হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছেন, বই লিখেছেন অনেকে। আমি সেগুলির বেশ কয়েকটি পড়েছি। লেখকরা একটি বিষয়ে একমত যে — (১) ইসলাম দারুণ রকমের ধর্মান্ধ এবং মৌলবাদী, (২) প্রচন্ড রকমের স্বৈরতান্ত্রিক। গণতন্ত্র এবং ইসলাম দুটি পরস্পরের বিরোধী। ইসলামে গণতন্ত্রের স্থান নাই।

নবী মহম্মদের জীবনী নিয়ে বাঙ্গালী পাঠকরা গোলাম মোস্তাফার লেখা বিশ্বনবী পুস্তকটি সম্পর্কে পরিচিতি। নবীর জীবনী বিষয়ে দুই বিদেশীর দুটি পুস্তক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। অনেকেই ইংরাজীতে লিখেছেন। আমি কেবল দুটি বিশেষ খ্যাতির বইর কথা বলছি — (১) Sir Willium Muir - Life of Mohomat, (২) Mohammad and Rise of Islam : D. S.

Margoliouth। তবে নবী মহম্মদের পুরো বিষয় নিখাদ পাওয়া যায় হাদিসে। ইমাম বুখারী বা মুসলিম-এর হাদিস বা আর যে চারটি শহী হাদিস আছে সেগুলি থেকে পাওয়া যায়। তেমনি কোরাণ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে খুব নির্ভরযোগ্য হ'ল — মওলানা শাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদীকৃত তরজমা কোরাণ-এ-মজিদ।

মুসলমানদের গর্ব এই কোরাণ, হাদিস এবং কোরাণ যার কাছে নাযেল বা অবতীর্থ হয়েছিল সেই নবী মহম্মদকে নিয়ে। ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকরা (theologians) বলেন যে, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ ধর্ম। Islam is a complete and completed Religion. জানিনা যাঁরা এই কথা বলেন তাঁরা আদৌ কোন অন্য ধর্মপুস্তক পড়েছেন কি-না। ব্যাপারটা এই রকম হতে পারে যে তাঁরা অন্য ধর্মতত্ত্বগুলির সঙ্গে ইসলামের কোন তুলনাই করেন নি। তবে 'আমর তিনি হারন নি, কারুর কথা মানন নি' — যদি হয় তবে তর্ক করতে যাওয়া বোকামো।

Understanding Islam through Hadis গ্রন্থে লেখক রামস্বরূপ বলেছেন — ইসলাম শুধু complete and completed Religion নয় এটি সমানভাবেই রাজনৈতিক এবং সামরিক - It is equally political and Military।

মওদুদী সাহেবের কোরাণ অনুবাদটিতে একটি বিশেষ সুবিধা আছে - তা হ'ল কোন পরিস্থিতিতে কোন সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। ফলে সূরার তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। দেখা যায় নবী মহম্মদ যখনই কোন বিশেষ অসুবিধায় পড়েছেন - তখনই একটি করে সুরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেগুলি তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে। তিনি যে পরিস্থিতিটির যে সমাধানটি চাইছেন, ঠিক সেই সমাধানটি আল্লাহ্‌র কাছে থেকে পৌঁছে যাচ্ছে।

সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কোরাণের সূরাগুলি নাযেল হয়েছে। আমরা সূরাগুলি সাজানো ভাবে কোরাণে দেখতে পাই, কিন্তু সেগুলি সেভাবে নাযেল হয়নি। যেমন প্রথম সূরা - সূরা ফাতিহা যে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে তা নয়।

কোর-আন ধর্মগ্রন্থে মোট সূরা আছে ১১৪টি এবং মোট আয়ত সংখ্যা ৬১৪১টি। নবী মহম্মদের কাছে প্রথম দিনে যে সূরাটি নাযেল হয়েছিল, সেটির নাম সূরা-আল-আলাক (কোর-আনের ৯৬ নং সূরা)। তাতে আবার এই সূরার মাত্র ৫টি আয়ত নাযেল হয়েছিল। পরে এই সূরার বাকী অংশ নাযেল হয়।

আর শেষ যে সূরা নাজেল হয়েছিল সেটির নাম সূরা নিসা (যেটি কোরাণে ৫নং সুরা)।

কোর-আনের প্রথম সূরার নাম সূরা ফাতিহা। বস্তুত সূরা ফাতিহা মানুষের একটি প্রার্থনা বিশেষ এবং মূল কোর-আন খোদার কাছ থেকে পাওয়া ঐ প্রার্থনার জবাব। ঈশ্বরে আত্মনিবেদনকে যদি আধ্যাত্মিকতা বলা যায় তবে আমার মতে সূরা ফাতিহা হল — একমাত্র আধ্যাত্মিক সূরা - যাতে ঈশ্বরের কাছে সত্যপথ প্রদর্শনের প্রার্থনা আছে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

ইসলাম বিশ্বাস করে যে এই দুনিয়া-জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সব কিছু এক মহাশক্তিমান বিধান কর্তার এবং সমস্ত সৃষ্টি ও সৃষ্ট সব কিছু সেই বিধানকর্তারি আনুগত্য স্বীকার করে। সেই বিধান কর্তারি নাম - আল্লাহ্। মানুষ তারই সৃষ্টি। তাই মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। আল্লাহ্র কাছে এই আত্মসমর্পনের নামই ইসলাম।

ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার আগে আল্-লা, আল-লাৎ, আল-মানাৎ প্রভৃতি নামের সঙ্গে আরবীয়রা পরিচিত ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাদের কাছে কোন নতুন শব্দ নয়। নতুন যেটি, সেটি হল - একমাত্র আল্লাই উপাস্য, তার কোন শরীক নাই এবং মহম্মদ তার প্রেরিত রসুল এইটি। শুধু আল্লাহ্কে মানলেই মুসলমান হওয়া যাবে না। একই সঙ্গে বলতে হবে যে মহম্মদ হলেন আল্লার রসুল। কালেমা আলোচনা করার সময় একথা উল্লিখিত হয়েছে।

সমগ্র ব্রহ্মান্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি। মানুষের সেই ঈশ্বরের অনুগত থাকা উচিত। এ পর্যন্ত ইসলামের সঙ্গে কারুর কোন বিরোধ নাই অন্ততঃ আস্তিকদের। কিন্তু ইসলামে নাস্তিকতা নাই। সবাইকেই আল্লাকে মানতেই হবে। বেশ এও না হয় মানা গেল যে, সমস্ত মানুষকেই ঈশ্বরকে মানতে হবে। কিন্তু তারপর ইসলামের দাবী যে আল্লাহ্ শব্দটিকেই ঈশ্বরের নাম বলে মানতে হবে, যে পদ্ধতিতে সেই আল্লার নাম নিতে হবে সেটি সকলকে মানতে হবে, মহম্মদকে রসুল হিসাবে মানতে হবে। যদি স্বেচ্ছায় মেনে নাও ভাল, নতুবা গায়ের জোর ব্যবহার করে মানানো হবে। এইখানেই আপত্তি। অন্যরা বলেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না এমন মানুষ থাকতে পারেন, ঈশ্বরকে উপাসনার পদ্ধতি প্রত্যেকে নিজের মত স্থির করতে পারেন, তার ঈশ্বরের নাম অন্য কিছু হতে পারে, আল্লি ছাড়াও ঈশ্বরের অন্য নামে বিশ্বাসী থাকতে পারে — এই সব সম্ভাবনা ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের দাবী পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম একটিই হবে, উপাসনা পদ্ধতিও একটি থাকবে। সেই ঈশ্বর হবেন নিরাকার এবং তার রসুল হলেন মহম্মদ।

এই মনোভাবকে বলা যায় - Exclusivistic বা স্বতন্ত্রবাদীতা। এ আর কাউকে স্বীকার করে না। এটাই হল মুসলমান গর্ব।

এই গর্ব মানুষের পৃথিবীতে 'ভাল' কী এনেছে তার যেমন হিসাব করতে হবে, কী খারাপ করেছে তারও হিসাব করা দরকার। আর এই ধরণের একটি Exclusivistic, একরোখা, একগুঁয়ে, স্বৈরতান্ত্রিক এবং সেই কারণে অগণতান্ত্রিক মন্ত্র যিনি প্রবর্তন করলেন তার মানসিকতা কী ধরণের ছিল আলি সিনার উল্লিখিত পুস্তকটি সেই প্রসঙ্গে।

Koenraad Elst নামে একজনের একটি বই আছে যেটিতে অবতারদের মনস্তত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির নাম — Phychology of Prophetism (Voice of India, New Delhi)।

যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী অথচ ধর্মান্ধ বা গোঁড়া নন, তারা এই বইটি পড়ে দেখতে পারেন। আলি সিনার বইটিও।

ভারতে ইসলাম প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে ভারতের মানুষদের আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে দু'এক কথা বলা দরকার। নখ, দাঁত তরবারী দিয়ে যারা ভারতের সব মানুষকে ধার্মিক (বলা ভাল ধর্মান্ধ) করতে এসেছিল এবং তাও এক বিশেষ ধরণের ধর্মে, তারা না জানত ভারতের ধর্ম, না জানত তার প্রাচীনত্ব। যারা এসেছিল তারা যুদ্ধ বুঝত। তরবারী বুঝত - জপ তপ বুঝত না। তারা নিষ্ঠুরতা বুঝত - দয়া, সহানুভূতি বুঝত না। তারা শত্রু হত্যা বুঝত, শত্রু জয় বুঝত না, ভোগ বিলাস বুঝত - আধ্যাত্মিকতা বুঝত না।

তারা যে দেশকে ইসলামায়িত করার জন্য মুসলমান গর্ব নিয়ে হাজির হল - তারা জানত না যে ভারতের আধ্যাত্মিকতা তর্ক করে না, বিরোধ করে না। তারা মানুষ ও মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হাজার হাজার বছর ধরে। তারা বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিকর্তা বহু নামে, বহু ভাবে আবির্ভূত। তাকে যে কোন নাম ডাকা যায় - তাকে পাওয়াও যায় অবতারের সাহায্য না নিয়েও। মানুষের সঙ্গে তার সৃষ্টি কর্তার সম্পর্ক সরাসরি, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার। ঈশ্বর এবং মানুষ এই দুই-এর মধ্যে একজন মধ্যস্থ অবশ্যই প্রয়োজন - এ তত্ব ভারতবাসী মানে না। তবে কেউ মানলে আপত্তিও করে না। গণতান্ত্রিকতা তার হৃদয়ে। ঈশ্বর কোন বাহ্যিক বিষয় নয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। নিজেকে জানলেই তাকে জানা হয়। এবং জীবন যাত্রার মধ্যে - দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, অসূয়া, শুচিতা ইত্যাদি থাকতে হবে।

ইসলাম যখন মুসলমান গর্ব সম্বল করে তরবারি নিয়ে এদেশে এল - এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ঈশ্বরের শরীক থাকবে না, তাই মূর্তিভাঙ্গা, মন্দির

যদি রাখতেই হয় তবে নিরাকারেরই থাকবে, সাকারের নয়, উপাসনা করতেই হবে এবং তা করতে হবে নবী মহম্মদ নির্দেশিত পথেই। এ তত্ত্ব খাওয়ানো গেল না। তাই অনেকে মুসলমান হল বটে, দেশ ইসলামায়িত হল না।

অন্ধ আনুগত্য ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় চিন্তায় একেবারেই অনুপস্থিত। অপর দিকে এই অন্ধ আনুগত্যই ইসলামের প্রধান মূলধন। তারা দেখল - নবী মহম্মদ নৈতিকতার স্রষ্টা। নৈতিকতা নবীকে মানতে হয় না। "To them morality derives from the Prophet's actions ; the moral is whatever he did. Morality does not determine the Prophet's activities." (Ramswarup) তারা জানে নরহত্যা মহাপাপ, তারা দেখল ধর্মের নামে নরহত্যা, পুন্য বলে বিবেচিত। সমগ্র মানব সমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল — একদল বিশ্বাসী অন্যরা সকলেই অবিশ্বাসী। কেবল মাত্র বিশ্বাসী হলেই বাঁচার অধিকার পাওয়া যাবে। তারা দেখল - পৃথিবীর সমস্ত দেশ দু'ভাগে বিভক্ত। এক ধরণের দেশ পবিত্র, অন্যগুলি অপবিত্র। এও না হয় মানা গেল। কিন্তু এখানেই থামা হল না। বলা হল - দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে 'বিশ্বাসী' করা হবে, সমস্ত দেশকে 'পবিত্র' করা হবে। কী ভাবে করা হবে ? উত্তর - তরবারী দিয়ে। চ্যালেঞ্জ হল - চেষ্টা করে দেখ।

তারা নিজেদের দেশে যে কাবা গৃহে প্রাচীনকাল থেকে আল্-লা, আল্-লাৎ, আল্ মানাৎ নামের দেব দেবীদের উপাসনা করত, সেগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। মূর্তিগুলি নষ্ট করেছে, বলেছে - 'মুশরিক লোকেরা না-পাক। অতএব এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদের হারামের নিকটও আসিতে না পারে (সূরা - তওবা, আয়ত-২৮)

এত মূর্তি বিরোধ। আল্লার শরিক থাকবে না। এতো ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিদ্যমান। ব্রাহ্মরাতো এই নিয়ে পৌত্তলিক হিন্দুদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। উপনিষদগুলিতো নিরাকার ঈশ্বরের কথাই বলে। তবে ইসলামের সঙ্গে পার্থক্যটা কোথায় ? তারা এত ক্রুদ্ধ কেন, কেন এত তরবারী আস্ফালন?

এই কারণেই যে, আল্লাহ্ বা ঈশ্বরকে শুধু নিরাকার এবং একমাত্র বলাই যথেষ্ট নয় মহম্মদকে রসুল মানতে হবে। কেবল আল্লায় বিশ্বাস মুসলমান বানায় না, সঙ্গে সঙ্গে রসুলকেই নবী বলে মানতে হবে। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে কলেমাগুলি পড়তে হয়, সেগুলিতে এই কথাই আছে। দেখা গেল যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত আয়োজন, প্রকারান্তরে তাই-ই এসে গেল নবী মহম্মদকে নিয়ে। যদিও নবী মহম্মদের কোন মূর্তি বা ছবি ইসলামে নিষিদ্ধ তবুও পৌত্তলিকতায় দেবতার যে স্থান, ইসলামে নবীও সেই স্থানে আছেন।

সমস্ত মানুষের জন্যই আল্লাহ্-ইসলাম গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তারা শয়তানের দলে এবং মুসলমানদের কাজ হল তাদের হত্যা করা - কারণ মুসলমানরাই আল্লার দলে। ইসলাম গ্রহণ না করা অতিশয় হীন কাজ এবং এর জন্য কঠোর শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ্ নিজেই সেই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং দাসত্ব (অমুসলমানদের) বৈধ করে দিয়েছেন মুসলমানদের জন্য। একেই জেহাদ বলে। এটা হল পবিত্র যুদ্ধ যার স্বাদ ইউরোপীয়রা চারশত বছর ধরে পেয়েছিল এবং তাদের জনসংখ্যা অর্দ্ধেক কমে গেছিল।

"Allah has made it obligatory for all humans to embrace Islam, those who refuse to accept it, qualify as the Satan's Party and must be eliminated by the Muslims, who rank as Allah's Party. Rejection of Islam is the most heinous crime that one can imagine, and for this reason one is liable to a terrible punishment. Allah himself declares war on infidels and legitimises the most despicable acts such as murder, rape, arson and enslavement of non-muslims, when they are committed to spread Islam. This is called 'Jehad' - the holy war. The west tasted its Holiness for four hundred years in the form of crusades, which reduced the European Population to half of its normal size."

[Islam - The Arab Imperialism - Anwar Shaikh. The Principality Publishers P.O. Box 918, Cardiff, Great Britain.]

কোন কোন সমালোচক বলেন যে, আল্লাহ্ যদি সব কিছু করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে সকলকে মুসলমান করেই সৃষ্টি করতে পারতেন তাহলে জেহাদের নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন হত না। (This is Jehad by Anwar Shaikh. A Ghosh Publishers, Houston U.S.A. P - Preface) He seems to be part of the design of the prophet Muhammad, who wanted to create an Arab Empire where his word must rank as the law and his person as the holiest. (সূত্র ঃ ঐ) আল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে নবী মহম্মদেরই সৃষ্ট। নবী আরব সাম্রাজ্য তৈরী করতে চাইছিলেন - যেখানে তার কথাই হবে আইন এবং তিনিই হবেন পবিত্রতম (অনুবাদ)।

আল্লাহতে বিশ্বাস হলেই মুসলমান হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে রসুল বলে মানতে হয়। "Thus Allah is just a figure-head, who leaves all administrative affairs to Muhammad. This is what makes

Allah a scabard and Muhammad the sword." (ঐ পুস্তক, পৃ. ৬) সংক্ষিপ্তভাবে - নবী মহম্মদ হলেন তরবারী আর আল্লাহ্ সেই তরবারীর খাপ।

"The analysis of the Kalemah and his success-story, however, clearly demonstrate that he opposed idolatory, to destroy all statues for raising himself to be the only idol." (ঐ পুস্তক, পৃ. ৭)। সংক্ষেপে - কলেমাগুলি বিশ্লেষণ করলে এবং নবী মহম্মদের সফলতাগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রমান হয় যে তিনি পৌত্তলিকতা বিরোধী ছিলেন। সর্বমূর্তিভেঙ্গে দিয়ে কেবলমাত্র নিজের ভাব-মূর্তি চাইলেন।

অবশ্য আল্লাহ্ সম্পর্কে নবী মহম্মদ যা বলেছেন তা-ই প্রথম এবং শেষ কথা। আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কারুর কোন সংযোগ ছিল না। নবী নিজেকে আল্লাহ্র দাস হিসাবে বর্ণনা করেছেন তবু কলেমায় তিনি আল্লাহ্র নামের সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিয়ে আল্লাহ্র সমকক্ষ হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্ অস্তিত্বহীন। তাই কেউ কেউ বলেন - আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্র প্রত্যাদেশমত (অহী) সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছেন, জেহাদের নামে নারকীয় অত্যাচার উদ্ভাবন করেছেন - নিজের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, কোন বিকল্প রাখেন নি।

নবী মহম্মদের পর আর কোন রসূল আসবেন না। অর্থাৎ সেই যুগে, সেই পরিস্থিতিতে, সমস্ত বিষয়ে যা যা ভাবা এবং বলা হয়েছে তারপর কাল অতিক্রম করলেও - কোন ভাবনার পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি, চিন্তা-মনন যা হবার হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু করা যাবে না কারণ কোরাণ শরীফে আল্লাহ্র যা বলার ছিল সবই নথীভূক্ত হয়েছে। নবী মহম্মদের দ্বারা। আর কোন নবী জন্মাবেন না। যা লেখা হয়েছে তার সংশোধন হবে না, নূতন কিছু লেখা হবে না।

নবী মহম্মদ মুসলমানদের বারবার তার এবং আল্লার জন্য শান্তি কামনা করতে বলছেন। দরুদ এবং নামাজ দুটোতেই।

শেখ আনোয়ার-এর পিতৃপুরুষ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পরিবারের ছিলেন। তারা ধর্মান্তরিত মুসলিম। বর্তমানে তিনি গ্রেট বৃটেনের বাসিন্দা।তার মতে পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধায় কাতর আরববাসীরা ইসলামে তাদের প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ যেমন পেয়েছিল, নিশ্চিত রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছিল। আল্লাহ্র নাম ব্যবহার করে নবী মহম্মদ তার নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন।

"The sex-starved Arabs, who also suffered pangs of hunger, eagerly seized this Divine opportunity, which promised, not only

gratification of the lust and release from starvation but also guaranteed secular suzerainity and splendour."

"This Allah, infact, is just a euphemism (ভাষার কৃত্রিম অলংকরণ) for Mohammad because He does what He is told by Muhammad, who simply take Allah's name to give his own commands a Godly status." (ঐ পুস্তক, পৃ. ১৯)

কোরাণের অন্যান্য অনুবাদ পড়লে বাঙ্গালী পাঠকরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। কিন্তু মওদুদী সাহেব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোন প্রেক্ষাপটে কোন সূরা নাযেল হয়েছে তা এত বিস্তৃত এবং সুন্দরভাবে লিখেছেন যে বুঝতে অসুবিধা হয় না - যখনই যে সমস্যার পড়েছেন নবী, তখনই তার মনোমত আয়তগুলি নাজেল হয়েছে।

মানুষ প্রভূত্বকামী। দু'রকমের প্রভূত্বকামিতা আমরা সচরাচর দেখি। এক রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে। রাজা, প্রধামমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি - এরা থাকেন পিরামিডের চূড়োয়। দুই - ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভূত্বকামীতা। নবী মহম্মদ দুধরণের প্রভূত্বই পেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আরবের ধর্মজগতে (পরে সারা দুনিয়ায়) ধর্মের বিষয়ে শেষ কথা তিনিই বলবেন আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরব দুনিয়ায় (পরে সারা দুনিয়ায়) তার কথাই হবে শেষ কথা। এমনকি তার মৃত্যুর পর অবস্থার এবং সময়ের যতই পরিবর্তন ঘটুক, শেষ কথা বলার জন্য আর কেউ জন্ম নেবে না। খলিফারা সেই জন্যে দুই রকম প্রভূত্বই করতেন। এবং ধর্মীয় প্রভূত্ব গ্রাস করত রাজনৈতিক প্রভূত্ব। রাজশক্তি কোন ধর্ম নিরপেক্ষ বিষয় হবে না, রাজশক্তি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে সেই প্রবর্তিত ধর্মের দ্বারা যা নবী মহম্মদ দিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন ওগুলো 'অহী', ওগুলি 'অহী' কি-না সে নিয়ে প্রশ্ন তোলার শাস্তি মৃত্যু।

আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে থেকে সমস্ত স্বাধীন চিন্তার সুযোগ স্তব্ধ হয়ে গেল। কোর-আন এবং হাদিশ কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বই নয়, এটি বিশ্বাসের, সমাজের, অপরাধ এবং শাস্তির, বাণিজ্যের, আচার আচরণের, অনুষ্ঠানের এমন কি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও যেমন পোষাক-আসাক, বিবাহ, যৌন সঙ্গম বা অন্যান্য বিষয়েও।

কোর-আন-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যা বলেছেন, মহম্মদের মধ্যে তা করিয়েছেন। একটি অহীয়ে মত্‌লু, অপরটি অহীয়ে গয়ের মত্‌লু। কোরাণ এবং হাদিশ পরিপূরক পরস্পরের।

কোর-আনের ৩৩নং সূরায় ৩৬নং আয়তে বলা হয়েছে - আল্লাহ্ এবং

তার রসুল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে দিয়েছেন, তখন সে ব্যাপারে কোন মুমেন পুরুষ ও কোন মুমেন স্ত্রীলোকের ফয়সালা করার একতিয়ার নাই। (সূরা-আহ্যাব)

জানা যায়, এমন যে বিখ্যাত, সুবিখ্যাত মুসলমান নেতা ইমাম ইবনে হানাবল (৭৮০-৮৫৫ খৃ.) জীবনে কখনও তরমুজ খান নি। কারণ, যদিও তিনি জানতেন নবী মহম্মদ তরমুজ খেতেন, কিন্তু কীভাবে খেতেন - তা তিনি জানতেন না, কোন হাদিশে পাওয়া যায় না নবী মহম্মদ কীভাবে তরমুজ খেতেন, তাই ইমাম ইব্‌নে হানাবল সারাজীবন তরমুজ খান নি। খেলেন না। ভক্তি তথা হাদিশের চূড়ান্ত প্রয়োগ। বাংলায় আমরা কোন বস্তু বা বিষয়ে বা মানুষের অনেক খোঁজাখুঁজির পর, যদি সন্ধান না পাই, তবে বলি - হদিশ নাই। অর্থাৎ হাদিশে নাই। হাদিশ সর্ব বিষয়ে এত ব্যাপক যে, যে কোন বিষয়েই সেখানে সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

আনুগত্য বা ধর্মান্ধতা যা নামেই বলি না কেন, হাদিশ এবং কোর-আনের প্রভাব এমনই। কোরাণ এবং হাদীসের বাইরে মুসলমানদের আর ভাববার কিছু নাই। সব ভাবনা ভাবা হয়ে গেছে। সব সমস্যারই সমাধান দেওয়া আছে। এবং তা দেড় হাজার বছর আগেই। মুসলমানদের ঐ দেড় হাজার বছর আগে বলা হয়েছে - ইসলাম বিশ্বাসী মানুষ বানাও এবং অপবিত্র দেশগুলিকে পবিত্র কর।

সমালোচনায় কেউ কেউ বলেছেন, "It proves beyond doubt that Allah and Mohammad are one and the same person because they decide and command together ; again, disobedience to Mohammad is disobedience to Allah and vice-versa."।

"সন্দেহের কোনও কারণ নাই যে আল্লাহ্ এবং নবী মহম্মদ একই ব্যক্তি। মহম্মদের প্রতি অবাধ্যতার অর্থই হল আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা আর আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতার অর্থই হল নবীর প্রতি অবাধ্যতা।"

"It is the prophet who wants to be adored. God is jsut a euphemism for the prophet. Revealation is the device to achieve this aim."

(সূত্র ঃ Islam - the Arab Imperialism, P. 35 and P. 53)

সংক্ষেপে - রসুল তাঁরই পূজা চান। আল্লাহ্ বা ঈশ্বর শুধু কথার কথা। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হচ্ছে রসুলের অস্ত্র বিশেষ।

অনেক ভেবে চিন্তে একটি কথা বেশ স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, ইসলামে Freewill বা স্বাধীন চিন্তার কোন স্থান নাই। যে চিন্তা ১৫০০ আগে আল্লাহ্

এবং নবী করে গেছেন সেটাই শেষ চিন্তা। অথচ জীব এবং জড়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এখানেই যে - জড়ের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নাই, জীবের আছে। এই চিন্তার সুযোগ আছে বলেই জীব উন্নত হয়েছে। এই মুক্ত চিন্তা বা Freewill হল প্রগতির ভিত্তি। পছন্দ করার স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা - স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। এর ফলেই উন্নতি হয়, প্রগতি হয়। মানুষকে অগ্রোন্নতির সুযোগ দেয়।

ইসলামের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। আধ্যাত্মিকতা যদি আত্মার বিকাশ বোঝায়, ইসলামে সেরকম কোন বিধান আছে কি ? নরহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি এখনকার দিনে অপরাধ বলে গণ্য। তাহলে দুনিয়া থেকে অবিশ্বাসীদের, বিশ্বাসী বানানোর যে জেহাদ-এর বিষয় এসেছে - আধুনিক যুগে তা কি করা যাবে ? এবং এই কাজগুলি কি আধ্যাত্মিকতা ? ইসলামে লুঠের মাল পর্যন্ত বৈধ বলা হয়েছে ? আধুনিক আইনে একে কি বৈধ রাখা যাবে ? Excluvistic হলে সমাজ চলবে ?

বিষয়বস্তু হিসাবে কোরাণ গ্রন্থের আয়তগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

(১) যে সব বাণীকে শাশ্বত বলা হয়।
(২) সৃষ্টি বিষয়ক।
(৩) পূর্বের নবীদের ইতিহাস বিষয়ক।
(৪) তৎকালীন আরবীয় সমাজ বিষয়ক।
(৫) ইসলামের ধর্মীয় নীতিরীতি বিষয়ক
(৬) জিহাদ ও গণিমতের মাল বা লুঠের মাল বিষয়ক।
(৭) অপরাধ ও তার শাস্তি বিষয়ক।
(৮) স্বর্গ-নরক বিষয়ক
(৯) তাৎক্ষণিক সমস্যা বিষয়ক।

ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরাণে আধ্যাত্মিক শিক্ষা কী আছে তা আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। কেবলমাত্র আল্লাহ্ কে ভয় কর, তার আদেশ পালন কর, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সব দেখতে পান - ইত্যাদিকে যদি আধ্যাত্মিকতা বলা যায় তাহলে অন্য কথা। কোন মানবিকতার কথাও আমার নজরে পড়েনি। হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। তবে যে গ্রন্থে বলা হয়, "অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও ; এবং তাহাদের ধর, ঘেরাও কর, এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের খবরাখবর লওয়ার জন্য শক্ত হইয়া বস। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, নামাজ আদায়

করে ও যাকাত্ দেয়, তাহা হইলে তাহাদের ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা-তওবা, আয়ত-৫)

সে ধর্মে মানুষকে ভালবাসা, ঈশ্বরকে ভালবাসার কথা আসেই না। কেবল মুসলমান ছাড়া আর কেউই যদি মনুষ্য পদবাচ্য মনে না হয়, তাহলে আধ্যাত্মিকতায় শিক্ষা কোথায় পাওয়া যাবে ? নিশ্চয় শুধুমাত্র মুসমলান আর আরবীয়দের নিয়ে এই পৃথিবী নয়। শুধুমাত্র মুসলমানদের ভালবাসাই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, তাহলে ইসলাম অবশ্যই আধ্যাত্মিক ধর্মগ্রন্থ।

মিশকাত্-এর হাদিশে (৫৭৫১ নং) বলা হয়েছে — "আরবীয়দের ভালবাস তিনটি কারণে (১) আমি একজন আরবীয়, (২) পবিত্র কোর-আন গ্রন্থ আরবীয় ভাষায়, (৩) স্বর্গের অধিবাসীদের ভাষা হবে আরবীয়।"

তাহলে ভালবাসা কাকে দেব এবং কেন দেব, তার মধ্যে মানবতাকে ভালবাসার প্রসঙ্গই নাই।

নবী মহম্মদ আরবে নিরাকার আল্লাহ্র উপাসনা প্রচলন করার আগে পৌত্তলিকতা ছিল। কাবা গৃহে ৩৬০টি দেবদেবী মূর্তি ছিল। বর্তমান যে 'হাজার আসোয়াদ' (কৃষ্ণপ্রস্তর) তা বহু আগেই থেকেই বর্তমান ছিল।

৫৭০ খৃষ্টাব্দে নবী মহম্মদের জন্ম হয়। ৬১০ খৃষ্টাব্দের শবে কদর-এর রাত্রিতে, সর্বপ্রথম কোরাণের বাণী (সূরা-আলাক-এর ৫টি আয়ত) অবতীর্ণ হয়। তখন থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে কোরাণ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। জীবনের অন্তিম আয়াত আছে সূরা বাকরার ১৮২ নং আয়ত। তবে শেষ সূরাটি হল - কোরাণ মজিদ-এ উল্লিখিত সূরা মায়েদা (৫নং সূরা)।

কোরাণের আয়তগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। নবী মক্কায় থাকাকালীন যেগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলিকে মাক্কী আর যেগুলি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলিকে মদিনী বলা হয়।

এইখানে একটু বিশদভাবে জানা দরকার যে মাক্কী আয়তগুলির সঙ্গে মাদিনী আয়তগুলির মেজাজ ও চরিত্রগত পার্থক্য। মক্কায় আল্লাহ্ বললেন, "আল্লাহ্ অত্যাচারীদের ভালবাসেন না", "নিশ্চয় অত্যাচারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে", "আল্লাহ্ অশান্তি উৎপাদন কারীদের ভালবাসেন না।" "আল্লা উদ্ধত ও অহংকারীদের ভালবাসেন না।" "কেউ ধৈর্য্য ধরলে বা ক্ষমা করলে তা বীরত্বের কাজ।" 'আল্লার প্রচার করাই রসুলের একমাত্র কাজ।" "তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে প্রিয়, আমার ধর্ম আমার কাছে প্রিয়।"

এই সব মাক্কী আয়তগুলি অহিংস এবং যৌক্তিক। মানব সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, বিশ্বমানবতা।

কিন্তু মক্কা থেকে যখন মদিনা চলে গেলেন (হিযরৎ) এবং মদিনায় যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হল, সেগুলি আর অহিংস, যৌক্তিক থাকল না। হিযরতের পরেই সুর বদলাল।

৬২২ খৃষ্টাব্দের ২১ জুন মদিনায় নবী মহম্মদ হিযরৎ করেছিলেন। তাহলে ৬১০ খৃষ্টাব্দে থেকে ৬২৩ খৃষ্টাব্দ এই ১৩ বছর ধরে মক্কার সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়। মদিনার সূরাগুলির মধ্যে, প্রতিহিংসা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি জেহাদি সূরাগুলি পাওয়া যায়।

নবী মহম্মদ নিজেকে এবং আরবকে দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র প্রভূত্বকারী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই চলেছিলেন। মদিনার সূরাগুলিতে দেখা গেল নবীকে ধর্মীয় নেতা, সামরিক নেতা, রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক নেতা হিসাবে। কোর-আনের বাণীগুলি তার হাত শক্ত থেকে শক্ততর করতে থাকল। কাফেলা লুঠ করে মুসলমান এবং নবীর আর্থিক অবস্থাও যথেষ্ট ভাল হয়েছে। বিশেষ করে বদরের যুদ্ধ জয় করে নবী এবং মুসলমানরা মানসিক শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

মক্কায় ইসলাম প্রথম অবস্থায় প্রচারিত হত গোপনে। এখন আর গোপনীয়তার প্রশ্নই নাই। বরং অমুসলমানদের হত্যা করবার জেহাদি আয়তগুলিও অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ এবং নবীর নাম তো একসঙ্গে উচ্চারিত হতই এবার দেখা গেল আল্লাহ্ পর্যন্ত নবীর সুখ্যাতি করছেন। আল্লাহ্‌তো নিরাকার ছিলেনই কিন্তু নবী মহম্মদ মানুষ ছিলেন। তার আকার, অবয়ব ছিল। মৃত্যুর পর নবী মহম্মদের কোন রূপ আঁকা নিষিদ্ধ হল। ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন কিছুরই প্রতিরূপ তৈরী করা চলবে না। আল্লাহ্ এবং নবী মহম্মদ ভিন্ন করাই গেল না।

রামস্বরূপ লিখেছেন, **Jihad is a divinely ordained institution in Islam. By many authorities it is counted as one of the pillars of Islam. Theologically it is an intolerant idea ; a tribal god, Allah, trying to be universal through conquest. Historically, it was an imperialist urge masked in religious phraseology (Ramswarup : Understanding Islam through Hadis, P. 99)**।

সংক্ষেপে ঃ একটি উপজাতির দেবতা - আল্লাহ্ (ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার আগেই আরবীয় উপজাতির লোকেরা আল্-লা-এর পূজা করত - লেখক) বিশ্ব স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করছে বিজয় অভিযানের মাধ্যমে। এটি একটি সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগ ধর্মের আবরণে ঢাকা।

শুধু তাই নয়, এক উপজাতীয় নেতা ও এই ধর্মের দোহাই নিয়ে বিশ্বজনীনতায় পৌঁছাতে চেয়েছেন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্মান্তরকরণে জাতীয়তারও পরিবর্তন হয়। যখনই কেউ মুসলমান হল - তার সংস্কৃতি হয়ে যাচ্ছে আরবীয়। কারণ তাকে নবী মহম্মদ প্রবর্তিত ব্যবস্থার মধ্যে থাকতেই হবে। আর নবী মহম্মদ প্রবর্তিত ব্যবস্থা মানেই আরবীয় জাতীয়তা (Arab Nationalism)।

"Here lies the crux : the Prophet Mohammad was an Arab, therefore, naturally he followd the Arab cultural tradition. Thus following him in all details of life means practising the Arab cultural hegemony and neglecting one's own national culture. This is what makes Islam, the Arab National Movement and destroys its religious veneer. [Islam and Human Rights : Anwar Shaikh. P. 164]

সংক্ষেপে বাংলায় ঃ এখানেই মূল কথা বা মূল সমস্যা। মুসলমান হলে নবী নির্দেশিত সংস্কৃতিতে থাকতে হবে। তিনি ছিলেন আরবীয়। তাই একজন অ-আরবীয় মুসলমানকে আরবীয় সংস্কৃতিতে চলে যেতে হয় নিজের দেশের সংস্কৃতি ভুলে। (লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, বা হাঁটু পেতে বসে, বা দাঁড়িয়ে কিব্‌লার দিকে মুখ করে তাকে প্রণাম জানাতে হয় - বা শ্রদ্ধা জানাতে হয় - কিব্‌লার দিকে মুখ করা বাধ্যতামূলক, কোন বিকল্প নাই - লেখক)

প্রথমে মক্কায় (পরে মদিনায়) প্রবর্তিত এই মতাবলম্বীদের একটা নাম দিতে হয়। নাম দেওয়া হল - মুসলিম অথবা হানিফ্। হিব্রু ভাষায় - এই শব্দের অর্থ বিশ্বাসঘাতক। সিরীয় ভাষায় হিদেন (যে খৃষ্টান, ইহুদি, মুসলমান কিছুই নয়, পৌত্তলিক, অসভ্য ব্যক্তি) মহম্মদের অনুগামীদের এই শব্দতত্ত্ব জানার কথা নয়। কিন্তু এই 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটিকে একটু সদর্থ দেওয়া হল। যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে শত্রুর হাতে সমর্পন করে সে বিশ্বাসঘাতক। এক্ষেত্রে সদর্থ যেটি দেওয়া হল, সেটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার নিজস্বতা কে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করে, সেই মুসলমান।

D. S. Margoliouth তার Mahammad and Rise of Islam গ্রন্থে লিখেছেন — "...... since in Hebrew, the word means 'hypocrite' and in syriac, 'heathen', pious followers of Mohammad did not care to study its etymology. The other name 'Muslim' meant naturally 'traitor'........ whereas it ordinarily signified one who handed over his friends to their enemies, it was glorified into meaning one who handed over his person to God." [P. 117]।

নবী মহম্মদ এমন কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করেন বা এমন কতকগুলি

আচরণ পালন করতেন যা যে কোন মুসলমানকেই অনুসরণ করতে হবে। সেই মুসলমান যে জাতীয়তার মানুষ হোন না কেন, তাকে এই নিয়ম বা আচরণ মানতেই হবে। তার ফল দাঁড়াবে এই যে ক্রমশঃ সে তার নিজের জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তা ভুলবে, এমন কি তার শত্রুতাও করতে পারে বা করবে। সেই নিয়ম, বিধি, বা আচরণগুলিকে একত্রে 'সুন্নাহ্' বলা হয়। আচরণের কয়েকটিঃ—

(১) মাটিতে বসে খাবে, (২) ডান হাতে খাবে, (৩) ধার থেকে খেতে হবে, (৪) খেতে বসার আগে জুতো খুলতে হবে, (৫) দুই হাঁটু মাটিতে লেগে থাকবে অথবা দুটি হাঁটু তুলে রাখতে হবে, অথবা একটি হাঁটু তুলে রাখতে হবে, (৬) খাওয়ার সময় সম্পূর্ণ চুপ থাকা চলবে না, (৭) তিন আঙ্গুলে খেতে হবে, (৮) খুব গরম খাবার খাবে না, (৯) ডান হাতে জল খেতে হবে, (১০) বসে জল খেতে হবে, (১১) তিন নিঃশ্বাসে জল খেতে হবে, এক চুমুক খাওয়ার পর জলের পাত্র থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিতে হবে, (১২) নিজের বিছানা নিজেকে করতে হবে, (১৩) বিছানা তিনবার ঝাড়তে হবে, (১৪) ডান দিক চেপে শুতে হবে, (১৫) ডানগালের নীচে, ডান হাতের তালু থাকবে, (১৬) হাঁটু দুটো একটু বাঁকিয়ে রাখতে হবে, (১৬) কিব্‌লার দিকে মুখ করতে হবে, (১৭) সূরা-ইসলাম, সূরা-ফালাক, সূরা-নাস ঘুমানোর আগে তিনবার আবৃত্তি করতে হবে, তারপর সারা শরীরে ফুঁ দিতে হবে, (১৮) ঘুম থেকে উঠে ডান হাতের তালু দিয়ে মুখমণ্ডল এবং চোখ ঘষে নিতে হবে, (পোষাক পরার সময় নবী মহম্মদ সবসময়ই ডান দিকের অঙ্গ ব্যবহার করতেন), (১৯) পোষাক খোলার সময় বাঁ দিক, (২০) পুরুষদের প্যান্ট/পাতলুম গোড়ালি (ankle)র উপর পর্যন্ত হবে, মহিলাদের পোষাক যেন গোড়ালির নীচ পর্যন্ত থাকে, (২১) পুরুষরা টুপি বা পাগড়ি, মেয়েরা উড়ানী ব্যবহার করবে, (২২) জুতো প্রথমে ডান পায়ে পরবে, (২৩) জুতো খোলার সময় বাম পায়েরটা আগে খুলবে, (২৪) শৌচাগারের যাওয়ার সময় মাথায় একটা ঢাকনা থাকবে, (২৫) শৌচাগারে প্রবেশের আগে 'দোয়া' করতে হবে, (২৬) বাম পা ফেলে ঢুকতে হবে, (২৭) মলমূত্র ত্যাগ কখনও দাঁড়িয়ে নয়, বসে করতে হবে, (২৮) শৌচাগার থেকে বেরুনোর সময় প্রথমে ডান পা, (২৯) বেরিয়ে 'দোয়া' (প্রার্থনা) করতে হবে, (৩০) শৌচাগারে কথা বলবে না, (৩১) মূত্র ত্যাগের সময় splash-এর ব্যাপারে খুব সচেতন থাকবে। (৩২) শুক্রবার ঘুসী স্নান করতে হবে, (৩৩) দাড়ি এক মুঠি পরিমাণ লম্বা হবে, (৩৪) জুতো বাম হাতে নিতে হবে, (৩৫) মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা আগে থাকবে, (৩৬) মসজিদ থেকে বেরোনোর সময়

বাম পা আগে, (৩৬) **Using a miswaak is a great sunna for Rasulullah. One who makes miswaak when making Wuzu and there after** performs salaah will receive 70 times more reward. It will also enable one to easily recite the Kalema at the time of death. [http : hubpages.com/hub/Islami. as quoted in Alisina's book]

প্রার্থনার আগে এই নিয়মগুলি মানতে হবে বা আচরণগুলি করতে হবে—

১। ঘোষণা করতে হবে যে উপাসনার উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে।

২। তিনবার জলের কুলি করতে হবে।

৩। নাকের ভিতর তিনবার জল ঢুকিয়ে তিনবার নাক ঝাড়তে হবে।

৪। মুখমন্ডল তিনবার ধুতে হবে।

৫। ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার, তারপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুতে হবে।

৬। ভেজা হাতে সারা মাথা অথবা এক অংশ একবার বুলিয়ে নিতে হবে।

৭। কানের ভিতর অংশ তর্জনী দিয়ে, বাইরের অংশ বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ভিজা হাতে বুলিয়ে নিতে হবে।

৮। ঘাড়ে ভিজা হাত বুলিয়ে নিতে হবে।

৯। গোড়ালি পর্যন্ত দুটি পা তিনবার ধুতে হবে ডান পা দিয়ে আরম্ভ করতে হবে।

(ইংরাজী বই থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে কোথাও যদি ভুল হয়ে থাকে মার্জনা করবেন।) মেসওয়াক শব্দের অর্থ সম্ভবত দন্তধাবন।

যদি কোথাও জল না পাওয়া যায় বা অভাব থাকে সেক্ষেত্রে নবী মহম্মদ 'তায়াম্মুম'-এর বিধান দিয়েছেন।

যে কোন জাতীয়তা বা রাষ্ট্রীয়তার মুসলমানকে যদি এগুলি মানতেই হয় তবে কিছুকাল পরে তার মানসিক পরিবর্তন স্বাভাবিক। এর সঙ্গে আর একটা ভাবনা জুড়তে হবে যে মুসলমানদের মাতৃভূমি ভিত্তিক, কোন জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশ বোধ, কোন দেশ ভিত্তিক বোধ থাকা অবাঞ্ছিত।, 'হেমায়েতে ইসলাম' তত্ত্ব অনুসারে একজন মুসলমান, অন্য এক মুসলমানকে সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তার ফলে এমন হতে পারে যে, কোন ঐস্লামিক দেশ যদি কোন অনৈস্লামিক দেশকে আক্রমণ করে বা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে অনৈস্লামিক দেশের মুসলমানরা, নিজের দেশ অর্থাৎ যে দেশে তারা বাস করে, সে দেশের কথা ভুলে গিয়ে আক্রমণকারী ঐস্লামিক দেশের পক্ষে যাবে। একাজ স্বাদেশিকতার তত্ত্বে ঠিক নয় কিন্তু ইসলাম ভ্রাতৃত্বের তত্ত্বে বেঠিক নয়। জাতীয়তার

পরিবর্তন এইভাবেই ঘটে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অল্প-বিস্তর আলোচিত হয়েছে।

একবার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে, সে আর ঐ থেকে বেরিয়ে অন্য কোন ধর্মে আশ্রয় নিতে পারবে না। নিলে তার জীবন সংশয়।

পাঁচটি মূল নীতি ও ধর্মাচরণের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। এদেরকে বলা হয় ভিত্তি বা পাঁচ স্তম্ভ — (১) কলেমা, (২) নামাজ, (৩) রোজা, (৪) জাকাৎ, (৫) হজ।

১। কালেমা হল ইসলামের ছয়টি মূলমন্ত্র। আগে উল্লিখিত হয়েছে। কলেমায় বিশ্বাস বা ঈমান না আনলে মুসলমান হওয়া যায় না। বড় কথা যেটি, সেটি হল কেবল আল্লাহ্তে বিশ্বাস মুসলমান হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সঙ্গে সঙ্গে এও বিশ্বাস করতে হবে যে, মহম্মদ আল্লার প্রেরিত রসুল। সমগ্র কোরাণের অনেক আয়াতেই বারবার বলা হয়েছে যে আল্লা ও তার রসুলের প্রতি অনুগত হও। (সূরা-৩, আয়ত ৩২) যারা আল্লা ও তার রসুলকে অমান্য করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (৭২/২৩) অর্থাৎ যে মুসলমান হবে না সে এক অপরাধী। কতটা মারাত্মক মনোভাব। ঠিক এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামাজের পর ইমাম যে খুৎবা পড়েন সেখানেও এই মনোভাব।

ঈদ-উল-ফিতর সর্বাপেক্ষা খুশী ও মৈত্রীর দিন। কিন্তু তা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য। অমুসলমানরা তো দারুন রকমের হীন - যে কোন খারাপ মুসলমানের থেকেও খারাপ। অতএব তাদের সঙ্গে খুশী ও মৈত্রী বন্টনের প্রশ্নই আসে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ওসমান গনি সাহেব ২০০৫ সালের ৪ নভেম্বর প্রতিদিন পত্রিকায় লিখেছিলেন যে, ঈদ-উল-ফিত্‌র উৎসব হিজরী দ্বিতীয় সনে অর্থাৎ ৬২৩ খৃষ্টাব্দে এবং ঈদ-উল্-আজহা হিজরীর ষষ্ঠ সনে অর্থাৎ ৬২৭ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়। প্রাক ইসলামী যুগে আরবে দুটি খুব বড় উৎসব পালিত হত - নিরাজ এবং মেহেরজান। ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার পর ঐ দুটি উৎসব বাতিল হয়। কিন্তু মানুষের মন উৎসব পিয়াসী। তা পূরণ করার জন্য নিরাজ ও মেহেরজান-এর পরিবর্তে - ঈদ ও বকর ঈদ চালু করা হয়।

অমুসলমানরা যতই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে মাথায় টুপী পাগড়ী বা গায়ে চাদর জড়িয়ে ঈদ-এর নামাজে যান, তারা কিন্তু জানেন না যে তাঁদের

এই ব্যবহারে মুসলিম মানসকিতার পরিবর্তন ঘটেনি এবং ঘটবেও না কারণ ইসলামী আয়ৎ ও বিধান অপরিবর্তনীয়। সমাজ এবং সময় পরিবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে ইসলামী বিধান ও আয়ৎ-এর সম্পর্ক নাই।

হরফ এর মুসলিম পঞ্জিকায় ১৪০০ বঙ্গাব্দে পৃ. ১৬৯-এ উল্লিখিত একটি খুৎবা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মূল নামাজ হওয়ার পর মুয়াজ্জীন খুৎবার নামাজের আজান দেবেন। তারপর ইমাম খুৎবা দেবেন। এই পবিত্র ছানি খুৎবার অংশ বিশেষ —

"হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের চিরকাল জয় যুক্ত করুন, আর অবাধ্য কাফের, বেদ অতি ও মোশরেকদের সর্বদা পদানত ও পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্, যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে, তার রাজ্যে চির অক্ষয় রাখুন। তিনি রাজার পুত্র হউন বা খাকান পুত্র খাকান হউক, স্থল বা নদীভাগের অধিকর্তা হোন, কিংবা দুই সাগরের মালিক হোন- তিনি পবিত্র মক্কা মদিনার সেবক হোন, কিংবা আল্লার পথে জেহাদ ও সংগ্রামকারী হোন, তিনি যদি মুসলিম রাজা হন, আল্লা তার অধিকৃত সাম্রাজ্যকে চির অক্ষয় রাখুন ..... তারই তরবারী দ্বারা বিদ্রোহী, মহাপাতকী ও অবাধ্যদের (কাফেরদের) মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ...... হে আল্লা আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের, বেদ অতি মোশারেকদের হে আল্লাহ তাদের দল ও সংঘকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিন। হে আল্লা, তাদের ঐক্যের মধ্যে মতানৈক্য আনয়ন করুন। হে আল্লা তাদের দেশ সমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন।...." (উদ্ধৃত ঃ ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী - ইসলামী ধর্মতত্ত্ব। পৃ. ৩৭) (অন্যান্য ইসলামী পঞ্জিকায় বাংলা হরফে আরবী ভাষায় ছানি খুৎবার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ পৃথকভাবে দেওয়া আছে - অনুবাদ নাই।)

বোঝাই যাচ্ছে, আপনি যে মহান প্রেরণা নিয়ে মৈত্রী এবং ঐক্য করতে যাচ্ছেন মুসলমানদের সঙ্গে, সেই মুসলমানরা আপনারই দেশে নির্মিত তাদের ভজনালয়ে আপনারই বিনাশ কামনা করছে। আপনার প্রতিক্রিয়া যাই-ই হোক, আপনার অবগতি থাকা প্রয়োজন।

২। নামাজ ঃ নামাজ সারাদিনে ৫ বার করতে হয় - ফজর-যোহর-আসর-মাগরিব-এশা।

কথিত আছে যে আল্লা প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। নবী মুশার পরামর্শে নবী মহম্মদ তিনবার যাতায়াতের পর আল্লাহ্ শেষ

পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করলেন। এই ৫ ওয়াক্ত নামাজই ৫০ বারের পুন্য দেবে।

নামাজ-এর আগে মুসলমানদের নামাজে আহ্বান করতে হয়। যিনি এই আহ্বান করেন তাকে মুয়াজ্জীন বলে। আরবী ভাষায় এই আজানের বাংলা হল —

(১) আল্লাহু আকবর (৪ বার) - আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(২) আশহাদুআল্লা ইলাহা ইলাল্লা (২বার) - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

(৩) আশহাদু আল্লা মহম্মদুর রসুলাল্লা (২ বার) - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহম্মদ আল্লার রসুল।

(৪) হাইয়া আ লাস্‌সলাহা (২ বার) - নামাজের জন্য এসো।

(৫) হাইয়া আ লালফালা (২ বার) - মঙ্গলের জন্য এসো।

(৬) আল্লাহু আকবর (২ বার)

(৭) লা ইলাহা ইল্লাল্লা (১ বার)

কলেমা আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে কালেমা তৈয়ব বলছে — লা ইলাহা ইল্লালা, মহম্মদুর রসুলাল্লা - আল্লা ব্যতীত উপাস্য নাই, মহম্মদ আল্লার প্রেরিত রসুল। মহম্মদকে রসুল হিসাবে স্বীকার করা বা না করার উপর নির্ভর করছে, আপনি মুসলমান বা অমুসলমান। এইভাবে নবী মহম্মদ নিজেকে আল্লার সঙ্গে একাসনে করে নিয়েছেন।

৩। রোজা ঃ আরবী বারটি মাসের নাম যথাক্রমে - মহরম্, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস- সানি, জমাদিয়াল আউয়াল, জমাদিয়স সানি, রজব, সাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্জ।

নবম মাস - রামজান মাস। এই মাসে রোজা পালনীয়। এ মাসটি অতি পবিত্র কারণ এই মাসেই প্রথম কোরাণ শরীফ নাযেল হয়েছে। রমজান মাস পুরোটাই (রোগী এবং মুসাফির ব্যতীত) সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত উপবাস থাকতে হবে। তবে, জিহাদের সময় রোজা বাধ্যতামূলক নয়।

৪। জাকাত ঃ জাকাত শব্দের অর্থ শুদ্ধিকরণ। আয়ের ৪০ ভাগের এক ভাগ দরিদ্রদের জন্য দান করে সঙ্গতি সম্পন্ন মুসলমানদের শুদ্ধ হওয়া ফরয। মুসলমানদের মধ্যে গরীবরা মুসলমানদের মধ্যে ধনীদের পাপ মুছে ফেলার রুমাল। জাকাত্ মুসলমান দেন কেবল মাত্র মুসলমানদেরই অন্য কাউকে নয় অর্থাৎ অমুসলমানকে নয়।

চারটি শব্দ এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক। জাকাত, সাদকা, ফেই এবং গণিমত। সাদ্কা শব্দের সাধারণ অর্থ হল - দান।

মক্কা থেকে নবী মহম্মদের উম্মত বা শিষ্যরা মদিনায় এল - এরা মুজাহির অর্থাৎ উদ্বাস্তু এদের জীবন ধারণ কী ভাবে হবে ? মদিনার মুসলমানরা দান দিয়ে ওদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে। মদিনারী এই সব মুসলমানদের বলা হত - আনসার বা সাহায্যকারী। এই যে মদিনার আনসারদের দান মুজাহির (মক্কা থেকে আসা উদ্বাস্তু মুসলমান) দের জন্য একেই বলা হত সদ্কা। সাদ্কা বিষয়ে আয়ত নাযেল হল (৯/৬০)। সাদ্কার টাকার এক অংশ ব্যয়িত হত দরিদ্র মুসলমানদের জন্য। এক অংশ ব্যয়িত হত সেই সব গরীবদের জন্য যাদের ঐ টাকা দিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা যাবে। কিছু অর্থ সাদ্কা সংগ্রহকারীদের বেতন, টি.এ., ডি.এ. বাবদ দেওয়া হত। যারা নূতন মুসলমান হয়েছে, কিন্তু খুশী নয়, তারা যাতে তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরতে না নারে তাই তাদেরও কিছু সাহায্য সাদ্কা থেকেই করা হত। কিছু অংশ আল্লার পথে, ব্যয় করা হত। আল্লার পথে ব্যয় মানে জেহাদের জন্য ব্যয়। ঘোড়া, অস্ত্র ইত্যাদি লুঠ ও দাঙ্গায় প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য ব্যয়কে 'আল্লার পথে' ব্যয় ধরতে হবে। অতর্কিত আক্রমণ করে কাফেলা লুঠ এবং জবরদস্তি ইসলামী বানানো জেহাদী কাজ। ধর্মযুদ্ধ বলতে যেমন পবিত্র একটা কিছু অমুসলমানরা ভাবেন, জেহাদ সেরকম কোন ব্যাপারই নয়। পরে মদিনায় যখন নবী মহম্মদ প্রতিপত্তি পেলেন তখন সাদ্কা (ঐচ্ছিক দান) যাকাত্ (বাধ্যতামূলক দান)-এ রূপান্তরিত হয়। নবী এবং তার পরিবার ব্যতীত সকলকে জাকাত দিতে হত।

গণিমত বলতে বোঝায় লুঠের মাল। মুসলমানদের কাছে লুঠ শাস্ত্র সম্মত এবং লুঠে যে মাল পাওয়া যাবে তার ভাগ নেওয়াও শাস্ত্র সম্মত। নবী মহম্মদের জীবিত কালেই মদিনায় তার নির্দেশে ৮২টি অতর্কিত আক্রমণ ও লুঠের ঘটনা ১০ বছরে ঘটে। তার মধ্যে ২৬টিতেই নবী নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেগুলিকে খাজোয়াত্ বলে, অন্যগুলি তার নির্দেশে হলেও তার নেতৃত্বে হয়নি - তাই ওগুলিকে সারিয়া বলে। নবী মহম্মদের মৃত্যুর কিছু কাল পরে জাকাত্-এর থেকেও, অর্থ সংগ্রহের ও ভরণ পোষণের জন্য গণিমত অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গণিমতের মাল কী ভাবে বন্টন হবে - এই নিয়ে যখন সমস্যা দেখা দিল তখন সূরা-আনফাল নাযেল হল। ঐ সূরার ১নং আয়তে বলা হল - যে

গণিমতের সবটাই আল্লাহ্ এবং তার রসুলের। কিন্তু তাহলে যারা এত ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করল তারা কী পাবে ? সূরা আনফালের ৪১নং আয়াতে আল্লা বলে দিলেন যে, গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং তার রসুলের। আল্লাতো ভাগ নিতে আসছেন না, অতএব সবটাই রসুলের। অতএব গণিমতের এক পঞ্চমাংশ রসুল নিজের জন্য রেখে বাকীটা উম্মতদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। ঐ এক পঞ্চমাংশ হল 'খুম'। তা থেকে রসুল নিজের ও পরিবারের খরচ চালাবেন। বাকীটা (১) গরীব মুসলমানদের জন্য, (২) অনুচরদের উপহার, (৩) বিধর্মীদের ধর্মান্তরকরণ, (৪) আল্লার পথে।

মনে রাখতে হবে যে, গণিমতের মাল মানে শুধু জিনিসপত্র, টাকাকড়ি নয়, মহিলা এবং শিশু ও পুরুষরাও বটে। মহিলাদের বন্টন করা হত উম্মতদের মধ্যে। গণিমতের সেরা মালকে বলা হত - সফিয়া।

লুঠের মাল যে মুসলমানদের জন্য বৈধ তা সূরা আনফালের ৬৯নং আয়তে বলে দেওয়া হল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গণিমতের মাল বন্টনের বিষয়ে কখনও কখনও রসুলের বিচারধারা কারুর অপছন্দের কারণ হয়েছিল।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে নবী মহম্মদ সমস্যায় পড়লেই আয়াত নাযেল হত - মহম্মদের সমর্থনে। মওদুদী সাহেবের কুরাণের অনুবাদ পড়লে প্রতি সূরার পশ্চাৎভূমি জানা যায় এবং বুঝতে কষ্ট হয় না যে নবী মহম্মদের সুবিধাজনক কথাগুলিই আয়ত হিসাবে নাযেল হত। গণিমতের মালের ভাগ অনেকেই চাইত। রসুল জিজ্ঞেস করতেন - প্রার্থনাকারী মুসলমান কি-না। যদি জানা যেত সে মুসলমান নয়, রসুল তাকে মুসলমান হয়ে যেতে বলতেন। (মুসলিম হাদিশ - ৪৪৭২)। দেখা গেছে গণিমতের মালের লোভেই মুসলমান জেহাদকারীর সংখ্যা বাড়ছিল। (বাংলাদেশে থেকে হিন্দু বিতাড়নের পিছনেও একই প্রেরণা কাজ করে) ফেই তখন বলা যায়, যখন জেহাদ করা হ'ল না, গণিমতের মাল এল না, কেবল ভয় দেখিয়ে বিধর্মীদের কাছ থেকে ধনসম্পদ হস্তগত করা হল।

নবী মহম্মদের মৃত্যুর পর আবু বকর মুসলিম জগতের প্রথম খলিফা হন। তার আমলে প্রথম বছরে মক্কা ও মদিনার মুসলমানরা মাথা পিছু ৯ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) করে জাকাত পায়। দ্বিতীয় বছরে তা বেড়ে ২০ দিরহাম হয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময়ে মিশর ও ইরান জয়

হয়। ফলে নবীর মৃত্যুর ২০ বছর পরে দেখা গেল - নবীর প্রত্যেক বিধবা বাৎসরিক ১২ হাজার দিরহাম, বদর যুদ্ধ অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকে ৫ হাজার, বদর যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তারা প্রত্যেকে ৪ হাজার তাদের বংশধরেরা প্রত্যেকে ২ হাজার দিরহাম বাৎসরিক পেত। (সূত্র ঃ ড. ব্রহ্মচারীর ঃ ইসলাম তত্ব, পৃ. ৪৮)

৫। হজ ঃ আরবি হজ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল - যাত্রা করা, বাইরে যাওয়া - to set out. বিশেষ অর্থ হল তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া। মুসলমানদের কাছে 'হজ' হল - মক্কা ও মদিনা সহ ইসলামের অনান্য পবিত্র স্থান দর্শন করা এবং বিশেষ কিছু রীতি-নীতি পালন করা। সারা জীবনে অন্ততঃ একবার হজ করা ফরয্।

হজের সময় আরবি বছরের শেষ তিনমাস - শওয়াল, জিলকদ্, জিলহজ্। অন্য সময়েও হজ করা যায় -তখন তাকে বলা হবে 'ওমরাও'। ঈদ-উল-আজহা বা বকর ঈদ-এর দিনই (জিলহজ মাসের ১০ তারিখ) সব থেকে পছন্দের দিন।

হজে যাওয়ার আগে যাবতীয় ঋণ মিটিয়ে দেওয়া উচিত, সমস্ত গচ্ছিত ধন ফেরত দেওয়া উচিত এবং হজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসা উচিত। যারা হজ করে আসেন, মুসলমান সমাজে তাদের হাজী বলা হয়।

ইসলামের আগেও আরবদের মধ্যে হজ করার রীতি ছিল। হজের পর তারা পিছন দরজা অর্থাৎ খিড়কি দিয়ে বাড়ীতে ঢুকত। সূরা বাকরার ১৮৯নং আয়তে এ প্রথার নিন্দা করে - সম্মুখের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়।

হজ যাত্রী দের সেলাই বিহীন কাপড় 'ইহরাম' পরতে হয়। দু টুকরো কাপড় এক টুকরো পরণে, এক টুকরো দেহে। ইহরাম কোন দিককার (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ) সেই অনুসারে ইহরাম বাঁধার স্থান নির্দিষ্ট আছে। যারা বিমানে যান তারা বিমানে ওঠার আগেই ইহরাম বেঁধে নেন। তখন তাকে 'মহরীম' বলা হয়।

দশম হিজরীতে নবী মহম্মদ তার জীবনের শেষ হজ সম্পন্ন করেন এবং উপস্থিত লক্ষাধিক মুসলমানের সামনে আরাফৎ প্রান্তরে বিদায় ভাষণ দেন। এই বিদায় ভাষণেই তিনি বিশ্ব্যাব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্বের - 'কুল্লে মুসলেমিন ইখুয়াতুন' নীতির ব্যাখ্যা করেন। মক্কা থেকে প্রায়

১৫ কিমি. দূরে আরাফা পর্বত। এই পর্বতের গা ঘেঁষে আরাফৎ প্রান্তর। আরাফৎ শব্দের অর্থ মিলন।

হাজীরা মক্কায় কাবা শরীফে নামাজ পড়েন এবং কাবা শরীফকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণকে তাওয়াফ্ বলে। ইসলামের আগে কোরেশ গোষ্ঠীর লোকেরা ব্যতীত আর যারা কাবায় আসত - তারা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। বিদায় হজের আগের বছর আল্লা সূরা-আরাফ-এর ৩১নং আয়ত অবতীর্ণ করে এই উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ্ নিষিদ্ধ করেন।

আরবি 'কাবা' শব্দের অর্থ ঘনক, যাকে ইংরাজীতে cube বলা হয়। মক্কায় কাবাই ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু। রাজনৈতিকভাবে সেই কারণেই আরব - সারা বিশ্ব ইসলাম সাম্রাজ্যবাদেরও কেন্দ্র বিন্দু। কেউ কেউ দাবী করেছেন যে অতি প্রাচীন কালে মক্কা ছিল মক্কেশ্বর শিব-এর মন্দির। সে সময় আরবে মূর্তি পূজাই রীতি ছিল। নবী মহম্মদ সেই মূর্তি পূজা কঠোর কঠিন হস্তে ও বিধি বিধানে রদ করেন কারণ ইসলামে আল্লাহ্ 'লা-শরিক' বে গায়েব। আল্লাহ্র কোন মূর্তি নাই। পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের আক্রমণ তীব্রতম সেই সময় থেকেই।

ইসলামী মতে কাবাগৃহ নির্মিত হয় আদম (আদি পিতা)-এর দ্বারা। কাদা ও পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, ছাদ ছিল না। নূহের প্লাবনের সময় তা ভেসে যায় এবং কালক্রমে এক বালির ঢিবিতে পরিণত হল। সেই ঢিবিকেই কাবা মেনে নিয়ে আরবিরা উপাসনা করত। এরপর প্রায় খৃ. পূ. ২০০০ সালে নবী ইব্রাহিম কাবা পুনর্নির্মানের জন্য আদিষ্ট হন। (সূরা ঃ বাকরা -১২৪ - ১২৭ আয়ত)। নবী ইব্রাহিম তার পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। দেওয়াল হল ছাদ হল না। আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আদেশ দিলেন হজ করার জন্য সকলকে আহ্বান করতে। (সূরা ঃ হজ আয়ত ২৬-২৭)। লাব্বাইক আল্লা হুম্মা লাব্বাইক, লব্বাইক লা শরিক লব্বাইক। ইন্নাল হামদা আন্নিয়মাতা লাকা আল্ মুল্ক্। লা শরিকা লাক-আমি হাজির। প্রভু আপনার আহ্বানে হাজির, আপনার কোন অংশী নাই। সকল প্রশংসা আপনার এবং আপনি সকল কিছুর প্রভু। আপনার কোন শরীক নাই। হজ করতে এসে হাজীরা ইহরাম বন্ধন নেওয়ার পর এই তালবিয়া পাঠ করেন। ইব্রাহিম যখন আল্লার আদেশে হজ-এর জন্য আহ্বান জানালেন তখন দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা 'আল্লাহুম্মা লব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলতে বলতে আসা শুরু করেন। এইভাবে হজ ক্রিয়ার সূচনা হল। (ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তক, পৃ. ৫৪)

নবী মহম্মদের যৌবনকালে মক্কার কোরেশ গোষ্ঠীর লোকেরা ইব্রাহিম

নির্মিত কাবার থেকে কিছুটা ছোট আকারে নতুন কাবা গৃহ নির্মাণ করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর হিজরীর ৬৪ সনে (আনু - ৬৮৬ খৃ.) আবদুল্লা-বিন-যুবায়ের ঐ কাবাকে ভেঙ্গে ইব্রাহিম নির্মিত কাবার মাপে আবার কাবা নির্মাণ করেন। ১০ বছর পরে (আনু. ৬৯৬ খৃ.) হজ্জাস-বিন-ইউসুফ সেই কাবা ভেঙ্গে নবী মহম্মদ যেমন মাপের কাবা দেখেছিলেন সেই আকারের কাবা নির্মাণ করেন। এই ইউসুফ নির্মিত কাবাই বর্তমানে রয়েছে। এর মাপ হল দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট, উচ্চতা ৫০ ফুট। ইব্রাহিম নির্মিত কাবার থেকে এই নব নির্মিত কাবায় প্রস্থ কম হওয়ায় পুরানো কাবার কিছুটা অংশ বাইরে চলে গেলেও তা মূল কাবাগৃহের অংশ হিসাবে স্বীকৃত। এই অংশটি হাতীম নামে পরিচিত। হাতীমে কেউ নামাজ পড়লে তা কাবার অভ্যন্তরেই হয়েছে বলে স্বীকৃত। একটি কালো কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে কাবাগৃহ ঢাকা থাকে। এই ঢাকনা কালো কাপড়ের নাম - গিলাফ্। গিলাফে কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ থাকে। হজের সময় (বছরে ১ বার) গিলাফ পাল্টানো হয়। কাবা শরীফে একটি মাত্র দরজা আছে। হজের মরসুমে দরজা খোলা থাকে বাকী সময় বন্ধ থাকে। হজের সময় হাজীরা গিয়ে কাবার ভিতরে 'হাজরে আসোয়াদ' কে চুম্বন করেন। ভীড়ে যারা কাবা গৃহের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারেন না, তারা বাইর থেকেই সাঙ্কেতিক চুম্বন করেন।

কাবার দক্ষিণ পূর্ব কোণে (রুকনে আসোয়াদ) ভূমি থেকে ৪-৫ ফুট উচ্চতায় এই হাজরে আসোয়াদ রক্ষিত আছে। প্রায় ৭ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় গোলাকৃতি এই 'হাজরে আসোয়াদ' ডজন খানিক ছোট ছোট কালো পাথরের টুকরো রক্তাভ সিমেন্টের মত কিছু দিয়ে জুড়ে তৈরী। (ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তকে উল্লিখিত) কথিত আছে যে, হজরৎ আদম কাবাগৃহ তৈরী করার পর ফেরেস্তা জিব্রাইল, স্বর্গ থেকে হাজরে আসোয়াদকে নিয়ে আসেন এবং সেখানে স্থাপন করেন, মক্কার কাবাগৃহে যত দেব দেবীর মূর্তি ছিল (৩৬০টি) সবগুলিই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। নবী মহম্মদও তাতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু হাজরে আসোয়াদ যেমনটি ছিল, তেমনটি আছে। কেবল নূহের প্লাবনের সময়, ফেরেস্তারা হাজরে আসোয়দাকে নিকটবর্তী আবু কুরায়েশ পর্বতের কাছে সুরক্ষিত রাখেন। হজরৎ ইসমাইল যখন কাবাগৃহ নির্মাণ করলেন, তখন জিব্রাইল তাকে হাজরে আসোয়াদ দিয়েদিলেন।

অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে ইসলাম ঘোরতর পৌত্তলিকতা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হাজরে আসোয়াদকে ঘিরে তাদের এই ধর্মীয় উম্মাদনা কি, পৌত্তলিকতার নামান্তর নয় ?

এরপর হাজীরা, কাবার নিকটবর্তী সাফা ও মারোয়া পর্বতে যান এবং

দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করেন। 'সায়ী' করার নিয়ম সাতবার। এই নিয়মের পিছনে একটি কাহিনী আছে - যা অনুল্লেখিত থাকল। মক্কাবাসী পৌত্তলিক কুরেশ গোষ্ঠীর লোকেরা সাফা ও মারোয়া পর্বতের উপর দুটি মূর্তি বানিয়েছিল, যা ইসলামী যুগে ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

ঐখানেই আছে মুসলমানদের অতি পবিত্র জমজম কূপ যা জিব্রাইল সৃষ্টি করেছিলেন বলে কথিত। হজ সেরে ফেরার সময় হাজীরা ঐ জমজম কূপের জল কোন পাত্র করে নিয়ে আসেন।

যে কোন দেশের মুসলমানই নিজের দেশের কোন 'পবিত্র জল' মানেন না। জাতীয়তার পরিবর্তন এই ভাবেই হয়েছে।

মওদুদী সাহেব তার বইতে লিখেছেন, 'হজকে উপলক্ষ্য করে মক্কাকে করে দেওয়া হয়েছে তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের এক কেন্দ্রভূমি। দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে আল্লাহর স্মরণকারীরা একই সময়ে সেখানে সমবেত হয়, একে অপরের সাথে মিলিত হয়, পরস্পরের মধ্যে ইসলামী মহব্বত কায়েম হয় এবং সকলের দিল্-এ এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুসলমান যে দেশের বাসিন্দাই হোক, আর যে বংশেই জন্মলাভ করুক - পরস্পর ভাই ভাই ও একই কওমের অন্তর্গত। এই জন্য হজ একদিকে আল্লাহ্‌র এবাদত (উপাসনা) অপর দিকে তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এক শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে তোলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমও হচ্ছে এই হজ্জ।'

(ইসলাম পরিচিতি ঃ সাইয়েদ মাওলানা আবুল আলা মওদুদী। পৃ. ১০৭)

বিদায় হজ অর্থাৎ নবী মহম্মদের শেষ হজে আরাফাৎ প্রান্তরে তিনি এই কথাই বলেছিলেন - 'কুল্লে মুসলেমীন ইখুয়াতুন'। বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্ব - যাকে বলা হয় - ইসলাম সাম্রাজ্যবাদ - ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক। নবী মহম্মদকে শুধু ধর্মীয় মহাপুরুষ বললে কম বলা হয়, তিনি এক রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যক্তিত্বও বটে।

'সায়ী' করার পর হাজীরা মক্কার নিকটবর্তী মিনা নামক স্থানে যান সেখানে রাত্রি যাপন করেন। এইবার সবাই 'রমি' করেন। নিকটবর্তী জুমরা নামক স্থানে এই 'রমি' হয়। 'জুমরা' শব্দের অর্থ - কাঁকর বা পাথরের টুকরো, রমি অর্থে নিক্ষেপ করা। তাহলে দাঁড়াল - পাথর ছোঁড়া, কাকে ? বড়, মেজ ও ছোট শয়তানকে। জুমরাতুল আকাশ, জুমরাতুল উস্তা এবং জুমরাতুল উলাকে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়তে হবে - তিনটি বিভিন্ন স্থানে। প্রত্যেক জায়গায় শয়তানের প্রতীক হিসাবে একটি করে স্তম্ভ তৈরী আছে। পাথর টুকরো ঐ পাথর স্তম্ভের দিকে নিক্ষেপ করতে হবে।

আবার হাজীরা মিনাতে ফিরে আসেন এবং কোরবাণীর প্রস্তুতি নেন। বকর-ঈদের কোরবানী এই মিনাতেই হযরৎ ইব্রাহিম তার ছেলে ইসমাইকে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আল্লাহ্র দয়ায় পুত্র ইসমাইল জীবিত ছিলেন, পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানী হয়েছিল।

'মিনা' শব্দের অর্থ প্রবাহিত। সম্ভবত কোরবানীর দিন এখানে লক্ষ লক্ষ পশুর কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত হয় বলেই এর নাম মিনা। জিলহজ্ মাসের ১০ তারিখে ইদুজ্জোহার নামাজের পর থেকেই ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোরবানী করা যাবে। কোরবানী হয় উট, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু ইত্যাদি। খুঁৎ যুক্ত প্রাণী কোরবানীর অযোগ্য। উটের বয়স অন্ততঃ ৫ বছর, গরুর অন্ততঃ ২ বছর, ছাগল ভেড়ার অন্ততঃ ১ বছর বয়স হওয়া চাই। ছাগল, দুম্বা ভেড়া একটি একজনের জন্য, গরু, মহিষ, উট একটি সাতজনের পক্ষে কোরবানী করা হয়। সূরা-হজ্জ, আয়ত ৩৬-এ বলা হয়েছে উট কত পবিত্র, কী ভাবে জবেহ্ হবে এবং লব্ধ মাংস কারা খাবে (সূত্র ঃ ২২/৩৬)। উটকে দাঁড় করিয়ে জবেহ্ করতে হবে। আগে আগে হাজীরা কোরবাণী করে সেই রক্ত কাবার দেওয়ালে লাগাতেন। পরে তা নিষিদ্ধ হয়।

বর্তমানে মিনাতে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটি নির্দিষ্ট স্থান কোরবানীর জন্য সংরক্ষিত। পশু ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি মজুত রাখে। হাজীরা দামদস্তুর করে কেনেন। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হাজীর হয়ে অন্য কেউ কোরবানী করে দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কোরবানীর বীভৎসতা উল্লেখ করেছেন আব্দুল আজিজ আল আমান - 'কোরবানীর জায়গায় এসে অবাক হয়ে গেলাম। এতখানি দুর্লভ বিস্ময় যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা জানা ছিল না। নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম কয়েক হাজার পশু জবেহ্ হয়ে পড়ে আছে, অধিকাংশই আবার একটির উপর একটি। এই সব দুম্বা, বকরি দলিত মথিত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অনেকটা দূরে। যেতে যেতে দেখলাম 'মিনা' আজ সত্যই রক্তস্রোতে 'মিনা' (প্রবাহিত) হয়ে উঠেছে। যারা কোরবানী করেছেন, কেউ কেউ দু'একটা রান ছাড়িয়ে কেটে নিয়ে গেছেন, কেউবা সিন্হা থেকে নিয়েছেন কিছুটা গোস্ত, বাদবাকী সবটাই পড়ে আছে।'

'মরা পশুর উপর দিয়ে পদচারণা সে এক ভয়ংকর ব্যাপার, চামড়ার উপর পা দিয়ে বহুবার পিছলে পড়তে পড়তে টাল সামনে এবং বার কয়েক আছাড় খেয়ে হাতে পায়ে রক্ত মাখামাখি হয়ে অবশেষে কোরবানীর এলাকা পার হয়ে মুক্ত মাটিতে পা রাখলাম। সম্মুখে ভীষণ জটলা, হাজার হাজার

গরু, ভেড়া, দুম্বা, বকরী কেনা বেচা হচ্ছে।.... দাম দস্তুর মিটে গেলেই কোরবানীর লোক এগিয়ে আসবেন। এরা কসাই - কোরবানীর দিন কোরবানীও করেন। দামদস্তুর হয়ে গেলেই পশু এদের আওতায় চলে আসে। হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কোরবানী হওয়া পশুর উপর ফেলে দিয়েই কোরবানী করে দিয়ে পারিশ্রমিকের জন্য হাত বাড়ায়। মর্মান্তিক ভাবে লক্ষ্য করলাম একটি বকরী সম্পূর্ণ জবেহ্ হয়নি, সেই অবস্থায় তাকে ফেলে দিয়ে পারিশ্রমিকের জন্য দৌড়েছে। এরকম পাশবিকতা, এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।' (কাবার পথে ঃ আবদুল আজিজ আল আসান। ১ম খণ্ড, হরফ, পৃ. ৩৬২-৩৬৩)

এরপরও আমান সাহেব নিজে দুটি ছাগল কিনেছেন নিজের হাতে কোরবানী করবেন। সেই বধ্যভূমিতে আশ্চর্য দুটি মায়াভরা হরিণ চোখে সেই অবোধ পশুগুলি তার দিকে তাকিয়েছিল। আমান সাহেব লিখেছেন, "দেখলাম, আমার হাত কাঁপছে, এই সুন্দর জিনিসটাকে আমি হত্যা করব ?"

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী আমান সাহেবের এই বর্ণনা করে লিখেছেন যে, আমান সাহেব ভাতে জলে বাঙ্গালী, তার বাঙ্গালী নাম নাই, কবে কোন পূর্বপুরুষ মুসলমান হয়ে বাঙ্গালী নাম ছেড়েছেন। আমান সাহেব শুধু বাঙ্গালী নাম নয়, পিতৃ-পুরুষের পরিচয়ও ত্যাগ করেছেন। তিনি আর এই সুজলা-সুফলা বাংলাকে পুণ্যভূমি বলে মনে করতে পারছেন না। ইসলাম তাকে শিখিয়েছে মরুময় আরবভূমিই তার পূণ্যভূমি। আর আল্লাহ্র আদেশে তিনি সেই পূণ্যভূমিতেই তীর্থ - হজ্ পালনে গেছেন। তার নিজের দেশের সঙ্গে তো সেই মরুময় আরবভূমির কোন মিল নাই। সে মানব সমাজে তার পবিত্র আল্লার দ্বীন জন্মলাভ করেছে, সেই মানব সমাজের সঙ্গেও তো বাঙ্গালী সমাজের মিল নাই। আরব সমাজ পশুপালক সমাজ, সেখানে পশু হত্যা করে মাংস খাওয়া জীবন ধারণের অঙ্গ, হয়ত সহজে পশু বধ তাদের মনে কোন দাগ কাটে না। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজেতো পশু হত্যা করে জীবন ধারণ করতেই হবে এমন নয়।

জাতীয়তার পরিবর্তনের লক্ষণটি পরিস্কার। মানসিকভাবে তিনি আরবভূমির যতটা কাছের, নিজের মাতৃভূমির কাছে ততটা নয়। প্রশ্ন থাকছে, আরব সমাজকে নবী পশু কেরবানী করতে বলবেনই। পরিত্যক্ত ইসমাইলও তার মা হাজেরা, মাংস, জল খেয়েই বেঁচে ছিলেন। তাই পশুবধ হয়ত অনিবার্য। কিন্তু একজন বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে পশুবলিতো অপরিহার্য নয়।

জলের অভাবের কারণে তায়াম্মুম করে শুদ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু নদীনালার দেশে তায়াম্মুম করে শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আরবে জলের অভাবে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন-শুক্রবার গোসল করার বিধান আছে। সেই বিধান কি বাঙ্গ

ালীর পক্ষে প্রয়োজন ? নবী মহম্মদ ছিলেন আরবি। ঐ ভাষাতেই কোরাণ। তার কাছে আরবি ভাষা মাতৃভাষা - প্রিয় ভাষা। আমান সাহেবের মাতৃভাষা কি তার কাছে পবিত্র ভাষা নয় ? যে দেশের জল মাটিতে তিনি বড় হলেন, সেই দেশের জল মাটির থেকে মরুময় আরবভূমির মাটি তার কাছে বেশী পবিত্র হল ?

এ প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীন অনুগামীদের শুধু পশু কোরবাণীর আদেশ দিয়ে থেমে থাকেন নি। আমরা দেখব, তিনি অমুসলমানদের অর্থাৎ কাফেরদের উদ্দেশ্যেও কঠোর আদেশ দিয়েছেন। সূরা-তওবার ৫নং আয়ৎ, সূরা বাকরার ১৯১নং আয়ৎ, সূরা নিসার ৮৯নং আয়ত এবং ৯১নং আয়ত, সূরা তওবার ১২৩নং আয়ত, সূরা আনফালের ৩৯নং আয়ত, সূরা মহম্মদের ৪নং আয়ত, সূরা মায়াদার ৩৩নং আয়ত, সূরা আয়হাবের ৬১নং আয়ত - মনুষ্যবধ ও নির্যাতনের নির্দেশ।

বিস্ময়কর এই যে একটি ধর্মপুস্তক আর সেই ধর্মের একমাত্র নেতা - আমরা যাকে 'নিষ্ঠুরতা' বলে ভাবতে ও মানতে অভ্যস্ত - সেই নিষ্ঠুরতার নির্দেশ দেন !

বিদায় হজ্ (নবী মহম্মদের শেষ হজযাত্রা)-এর সময় আল্লার রসুল মদিনা থেকে ১০০টি উট এনেছিলেন কোরবানী করার উদ্দেশ্যে নবীর ইচ্ছা ছিল তিনি নিজেই ১০০টি উট কোরবানী করবেন। উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় কোরবানী করার নিয়ম। তিনি ৬৩টি উট জবেহ্ করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বাকী ৩৭টি উট তার জামাতা তথা চাচাতো ভাই আলীকে দেন।

এই প্রসঙ্গে নবী মহম্মদের একটি কাজ উল্লেখ্য। ইমাম বুখারীর শহী হাদিশে এটির উল্লেখ আছে। একবার উকল গোত্রের কয়েকজন লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তারা অসুস্থ হলে উটের দুধ ও পেচ্ছাপ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে উটশালাতেই রাখা হয়। সুস্থ হয়ে তারা উটরক্ষককে মেরে উট নিয়ে পালিয়ে যায়। নবীর লোকেরা খবর পেয়ে তাদের ধরে নিয়ে এল। তাদের প্রাণদন্ডের আদেশ হল। নবী তাদের নিজেই সাজা দেবেন স্থির করলেন। প্রথমে দুটো লোহার শিক আগুনে লাল করে তাদের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন, একটি ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাদের হাত-পা কেটে আলাদা করলেন এবং ঐ অবস্থায় মরুর তপ্ত বালিতে শুইয়ে রাখলেন। তারা মারা গেল। তাদের তৃষ্ণার জলও দেওয়া হয়নি। (সহীহ্ আল বুখারী ৬ষ্ঠ খন্ড, নং ৬৩৩৩-৬৩৩৬। প্রকাশক - মদিনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা)

আর একটি ঘটনা যেখানে নবীর হিম্মতের পরিচয় পাওয়া যায় - বনি

কুরাইজ গোষ্ঠীর লোকেরা মুসলমান বাহিনীকে আসতে দেখে - দুর্গে আশ্রয় নিল। নবী তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। ৪৫ দিন পরে তারা আত্মসমর্পন করল। নবীর এক প্রিয় পাত্র তাদের বিচার করে প্রাণদন্ড সাজা দিল। তাদের সংখ্যা ছিল ৬০০ থেকে ৯০০-এর মধ্যে। বাচ্চাদের হিসাব ধরলে ১০০০ হতে পারে। তবে ৮০০ সংখ্যাকেই ঠিক বলে ধরা হয়। বনি কুরাইজদের ধারণা ছিল যে এতজনকে নিশ্চয় হত্যা করা হবে না, কোন কড়া শর্তে মুক্তি হতে পারে। কিন্তু বিচারক রায় দিলেন - সব পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা হবে এবং গণিমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তাদের একটি গুদাম ঘরে রাখা হয়েছিল। সেই দিন রাত্রেই মদিনার বাজারে ৮০০ মানুষকে 'গোর' দেওয়ার মত এক বিশাল কবর খোঁড়া হল। পরদিন ফজরের নামাজ-এর পর থেকেই কোতল পর্ব শুরু হল।

Sir Willium Muir তার Life of Mahmet বইতে লিখেছেন, "The butchery began in the morning, lasted all day and continued by night till the evening. Having thus drenched the market place with the blood of seven to eight hundred victims ..... Mohammad returned from the horried spectacle to solace himself with the charms of Rihana whose husband and all her male relatives had just perished in the Massacre." [P. 319, Voice of India]

(সূত্র ঃ ড. ব্রহ্মচারী, পৃ. ৭৩-এ দ্রষ্টব্য)

মক্কায় অবস্থান, কাবা শরীফ পরিক্রমা, তাওয়াফ, সায়ী, রমি, কোরবানী, জমজম কূপের জল পান করে মোটামুটি হজ সম্পন্ন হয়। এরপর হাজীরা মদিনায় কিছু পূণ্য স্মৃতি ইত্যাদি দর্শন করেন।

৬। যদিও ইসলামরে ৫টি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে এবং আলোচিত হল, মাওদুদী সাহেব লিখেছেন যে, সর্বশেষ যে ফরজ আমাদের উপর আল্লাহ্‌র থেকে নিদ্ধারিত হয়েছে তা হচ্ছে - ইসলামের সহায়তা (হেমায়েতে ইসলাম)। এই ফরজটি যদিও ইসলামের স্তম্ভ সমূহের অন্তর্গত নয় তথাপি ইসলামী ফরয সমূহের মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল, জান, মাল দিয়ে একজন মুসলমান এমন কাজে অংশ নেবে যা মুসলমানদের পক্ষে তথা ইসলামের পক্ষে সহায়ক। সে মুসলমান ও ইসলামের দুশমনদের সাহায্য করে না। (সূত্র ঃ ইসলাম পরিচিতি ঃ মওদুদি, পৃ. ১০৯)

অর্থাৎ আপনাকে যদি কোন মুসললমান কোনও কারণে আক্রমণ করে, আপনার মুসলমান বন্ধুর কাজ হবে, আপনাকে নয়, আপনার আক্রমণকারী মুসলমানকে সাহায্য করা। আপনার অপরাধ যে আপনি অমুসলমান।

আরবে ইসলাম প্রবর্তিত হল মোটামুটি ৬১০ খৃষ্টাব্দে। নবী মহম্মদের জন্ম ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৩ বছর পরে ৬২২ খৃষ্টাব্দে ২১ জুন মদিনায় হিজরৎ। কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

পৃথিবীতে ইসলাম-এর বয়স ১৪০০ বছর। তার আগেও আরব দেশ ছিল। সেই প্রাক-ইসলামী আরব প্রসঙ্গে দু'চার কথা জানানর আগে হজ্জ এবং কাবা বিষয়ে দুটি কথা বলা দরকার।

(১) মাওদুদী তাঁর পুস্তক 'ইসলাম পরিচিতি'তে লিখেছেন — "মুসলমানদের জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা জরুরী। তাও কেবল এমন লোকের জন্য জরুরী, যারা মক্কা মোয়াযযমা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় বহন করতে পারবে।" (পৃ. ১০৬)

এ থেকে অনুমেয় যে হজ্জ যেতে হবে নিজের খরচে। কোন অনুদান গ্রহণ ঠিক নয়। কিন্তু সংবাদপত্রে পড়া যায় যে, ভারতের মুসলমানদের হজ্জ করতে যাওয়ার জন্য জাহাজ এবং বিমান ভাড়া বাবদ সরকার অনুদান দিয়ে থাকেন। এবং নেক মুসলমানরা তা গ্রহণও করেন। সরকার অবশ্য ভারতীয় হিন্দুদের কাছ থেকে তীর্থ কর আদায় করেন। ব্যাপারটা একটু বাঁকিয়ে ভাবলে বলা যায় যে, ভারতীয় সরকার, ভারতীয় হিন্দুদের (যারা এদেশে সংখ্যা গুরু অংশ) কাছ থেকে তীর্থকর আদায় করে ভারতের মুসলমান (যারা এদেশে সংখ্যালঘু) তাদের তীর্থ অনুদান দেন। 'আইনের চক্ষে সমানাধিকার' সংবিধানের একটি ধারা। সরকার সেই মৌলিক ধারাটি কীভাবে পালন করছেন, তা পাঠকরা ভেবে দেখতে পারেন।

(২) কাবায় হজ্জ করতে সকলেই যেতে পারতেন। এটি আরবের একটি প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নবী মহম্মদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অহী পেয়ে ঘোষণা করলেন যে, অংশীবাদী কাফেরদের জন্য কাবার পবিত্র এলাকায় প্রবেশ ও হজ্জ নিষিদ্ধ। মাওদুদী সাহেব লিখেছেন - এমন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় যে ইব্রাহিম নবীর (আঃ) প্রতিষ্ঠিত এই মহান প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ কাবা - লেখক) শেরক্-এর পঙ্কিলতায় মলিন হওয়ার কোন আশংকাই অতঃপর না থাকে। (তরজমা-এ কোরআন মজিদ পৃ. ২৮৮) (সূরা - তওবা - আয়ত - ১এর টীকা দ্রষ্টব্য)

প্রাক-ইসলামী আরব

আরব শব্দের অর্থ মরুভূমি। পন্ডিতেরা মনে করেন, এক কালে আরব

সাহারা মরুভূমির একটি অংশ ছিল। আরব বর্তমান খন্ডিত ভারতের প্রায় সমান এলাকা। ভারত ৩২.৮৭ লক্ষ বর্গ কিমি. আর আরব ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার লক্ষ বর্গ কিমি. আরবের বৈশিষ্ট্য হল - এটি পৃথিবীর শুষ্কতম অঞ্চল।

বর্তমান আরব ভূখন্ড ৮টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত। সৌদি আরব, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরব এমিরিটাস, ইয়েমেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, ইয়েমেন আরব রিপাবলিক, কুয়েত, বাহ্‌রিন। এই ৮টি দেশের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ প্রায়। প্রতি বর্গকিমি.তে লোক সংখ্যা কাছাকাছি ৭। খন্ডিত ভারতের প্রতি বর্গকিমি.তে প্রায় ২৫০। ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ১২২ কোটি আর সমগ্র আরব ভূখন্ডের ৮টি রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ।

আরবের উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি। অন্য তিন দিকে - লোহিত সাগর, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর। আরব ভূখন্ডে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম ৪ ইঞ্চি - ৬ ইঞ্চি খুব বেশী ১০ ইঞ্চি।

বৃষ্টিপাতের স্বল্পতায় আরবে কৃষি এবং কৃষক প্রায় অনুপস্থিত। মরুভূমিগুলিকে বাদ দিলে বাদ বাকি ভূখন্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরুদ্যান সমন্বিত মরু সদৃশ অঞ্চল। মরুদ্যানগুলিতে মাটির নীচে জল পাওয়া যায়। চাষবাস প্রধান খেজুর। এছাড়া সামান্য কিছু ফলমূল ও শাকসব্জি। বড় আকারের মরুদ্যানগুলি ধীরে ধীরে শহরে রূপান্তরিত হয়েছে।

মরু অঞ্চলে বেদুইন নামে যাযাবর জাতির লোকেরা বহু উপজাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করে। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গোষ্ঠী এবং কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে একটি উপজাতি। পশুপালন প্রধান জীবিকা। পশুর মধ্যে প্রধানত ভেড়া ও ছাগল। উট অতিশয় মূল্যবান। প্রধান খাদ্য - পশুমাংস, দুধ, খেজুর, কখনও কখনও ময়দা ও চাল। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এবং সে বাবদে মারামারি লেগেই আছে। ঘৃণা এবং আক্রমণ এদের মানসিকতায় বিরাট স্থান দখল করে থাকে। হত্যা কোন গুরুতর বিষয় নয় কারণ প্রতিশোধ বলতে হত্যাই বোঝায়।

মূল আরব ভূখন্ড কখনও কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আক্রান্ত হওয়ার মত কোন লোভনীয় দেশও আরব নয়। এখানে কোনকালে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। গোষ্ঠীগুলির অলিখিত নিয়মকানুনই চূড়ান্ত আইন। ছোট ছোট গোষ্ঠী এবং উপজাতিগুলি নিজ নিজ এলাকায় এক একটি রাষ্ট্র। গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্যই শেষ কথা।

কোন বিদেশী সংযোগ না হওয়ায়, বিদেশী জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণও হয়নি। তাই জাতিগত বিশুদ্ধতা ছিল। পৃথিবী থেকে একদম বিচ্ছিন্ন ভাবই দারিদ্র, অভাব, কঠোর পরিশ্রম এবং অনিশ্চয়তাই ছিল আরব ভূমির বৈশিষ্ট্য।

মরুভূমির রুক্ষ জলবায়ু, কঠোর জীবন সংগ্রাম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একটি বিশেষ গুণ আরববাসীদের ছিল তা হল - অতিথিপরায়ণতা। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহা, হত্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি এদের কাছে খুবই স্বাভাবিক ছিল কারণ প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করা বা শিক্ষার মাধ্যমে অন্য দেশের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে এগুলি পরিবর্তিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে আমরা যেগুলিকে অমানবিক বলে আখ্যা দিই, সেগুলি বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। কমাবার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি, কমানোর কোন উপায় বা ব্যবস্থাও ছিল না।

বেদুইনদের আর একটি বৈশিষ্ট্য দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন। যে সব বণিকরা দূরবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা বানিজ্য করতে কাফেলা নিয়ে চলত, সেই সব কাফেলা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আক্রমণ, হত্যা করে - উট সহ অন্যান্য সামগ্রী লুঠ। বণিকরা আগে থেকেই তাদের যাত্রাপথে যে সব গোষ্ঠীর এলাকা পড়ত, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে কাফেলা নিয়ে যেত।

মরুবাসী বেদুইনদের জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত না হলেও কালক্রমে মরুদ্যানবাসী এলাকাগুলি শহরে পরিণত হচ্ছিল, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন হয়েছিল। তবে আদি চরিত্র - নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিহিংসা, হত্যা, অতিথিপরায়ণতা ঠিকই ছিল। আর মক্কা, মদিনার মত শহরগুলির সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্যের কারণে বিদেশীদের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল। এই সব শহরে ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করতেন। মক্কায় বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোরেশরা ছিল অগ্রগণ্য। নবী মহম্মদ এই কোরেশ বংশেই জন্মেছিলেন। পরবর্তীকালে নবীর একজন চাচা ব্যতীত সকলেই ইসলাম নিয়েছিলেন। সূর্যের কিরণে ব্যতিব্যস্ত আরবের লোকেরা চাঁদ-এর স্নিগ্ধ আলো পছন্দ করত। আরবীদের মাসের হিসাব - চান্দ্র মাস। মুসলমানদের পরবগুলি সেই কারণেই প্রতি বছর ১০ দিন এগিয়ে আসে। কখনও প্রচন্ড গ্রীষ্মে রোজা এবং ঈদ আবার কখনও অন্য ঋতুতে।

সুজলা সুফলা ভারতবর্ষে বাস করে আরব দেশ কেমন তা কল্পনা করা যায় না। অথচ এদেশের বাতাস, জল ও অন্নে প্রতিপালিত সহজ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত কত মানুষ সেই আরবের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেন ! ভাবতেও বিস্ময় লাগে যে, অন্যের অধিকার স্বীকার করে নিলেই যেখানে শান্তি বজায় থাকে, সেখানে অন্যের অধিকার অস্বীকার করে বিবাদ, হানাহানি বাধে। অন্যের সম্পর্কে সামান্য সহনশীলতা, অন্যের প্রতি সামান্য মর্যাদা দিলে আত্মগর্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

আরবে এই কারণেই কোন সুস্থ সংস্কৃতি আগেকার দিনে গড়ে উঠে

নি। গোষ্ঠী গর্ব, উপজাতি গর্ব তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। অন্য কোন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তৃত সুযোগ ছিল না, ছিল না শিক্ষা, ছিল না কোন আইন প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

বাঙ্গালীরা ভাবতে পারেন যে তখন বাংলায় পাল রাজাদের শাসন চলছে। রাজা শশাংক (৬০৬-৬৩৭), তারপর কিছু কাল মাৎস্য ন্যায় - অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার যুগ, তারপর ৭৫০ খৃ. থেকে ১২০৬ খৃ. পর্যন্ত পাল ও সেন রাজাদের রাজত্ব। সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। কৃষি, শিল্প, বানিজ্য, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা সমস্ত দিকে অগ্রগতি। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় - নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়, দেবীকোট, জগদ্দল, মহাবিহার প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র।

ভৌগোলিক ভাবে আরবের স্থান ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে ইসলামীরা আরবকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বলত। আরব ছিল - এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশের মিলন ক্ষেত্র।

সুমেরীয় অঞ্চলের সঙ্গে মিশর ও ভারতের ব্যবসা বানিজ্যের প্রধান রাস্তা আরবের মধ্য দিয়ে হওয়ার কারণে, আরবের লোকেরা মিশরীয় ও ভারতীয় সভ্যতার কিছু পরিচয় পায়। সিন্ধু উপত্যকার লোকেদের সঙ্গে সুমেরীয়দের ব্যবসা-বানিজ্য চলত কিছুটা জলপথে ও কিছুটা স্থলপথে। সিন্ধু নদের মোহনা থেকে এডেন (বর্তমান নাম) বন্দর। সেখান থেকে স্থলপথে ঘুরে আর একটি পথ ছিল আধুনিক ইয়েমেন এলাকা থেকে লোহিত সাগর দিয়ে সুয়েজ, সেখান থেকে স্থলপথে মিশর।

ভারতীয় বণিকরা পণ্য সম্ভার নিয়ে যেত ইয়েমেন পর্যন্ত, সেখান থেকে আরবীয় বণিকরা নিয়ে যেত সুমের। মক্কার কোরেশ গোষ্ঠী এবং ইয়েমেনের ইহুদী গোষ্ঠী এই বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তখনও ইসলাম প্রবর্তিত হয়নি। ইহুদী ও আরবীয়দের মধ্যে সংঘাত হয়নি। ইয়েমেন বাঁধ বেঁধে জলের ব্যবস্থা করে চাষও করত। খৃ. পূ. ২৪ সালে রোমান সম্রাট আগষ্টাস সীজার আরবে অভিযান প্রেরণ করেন। ইয়েমেন তাদের দখলে যায়। জলের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে কৃষি ব্যবস্থা প্রায় অকেজো করে দেয়। তারপরও ইয়েমেন ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। নবী মহম্মদের মৃত্যুর একবছর পরেই ইয়েমেন মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। উত্তর আরবের লাঘমিড সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ৬০৫ খৃ. পারস্য সম্রাটের আক্রমণে।

ইতিমধ্যে নবীর জন্মের আগেই খৃষ্টধর্ম উত্তর আরবে কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তর আরবে এবং ইয়েমেনেও খৃষ্টান ধর্ম ছড়িয়ে ছিল। তাই নবী

মহম্মদের আগে আরব অঞ্চলে ইহুদী, খৃষ্টান সংখ্যা কিছুতো ছিলই। বাকীরা ছিল মূর্তিপূজক। মক্কা দখল করার পর নবী মহম্মদ কাবার অভ্যন্তরের মূর্তিগুলি ধ্বংস করেন। আরবের পৌত্তলিকদের মধ্যে তহন্নুত নামে এক প্রথা ছিল। রমজান মাসে মুসলমানরা যে রোজা রাখেন, তহন্নুত ছিল সেরকমই। হজ্জ ক্রিয়াও ইসলাম প্রবর্তনের আগেই চালু ছিল।

ইহুদিরা ছিল মোজেস উপাসক আর খৃষ্টানরা ছিল খৃষ্টের। পৌত্তলিকদের আল-লা, আল-মানাৎ-আল-উমা আল লাত ইত্যাদি নামের দেব দেবী ছিল। নবী মহম্মদের প্রবর্তিত ইসলাম ছিল সকলেরই বিরুদ্ধে। মুসলমান গর্ব হল- ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অতএব সকলকেই ইসলামী করতে হবে। ইহুদী এবং খৃষ্টানদের প্রতি কঠোরতা হয়ত একটু কম ছিল কারণ তাদের জন্য আল্লাহ্ ধর্মগ্রন্থ দিয়েছিলেন। তাই তারা ছিল - কিতাবী People of the Book। বাকীরা পৌত্তলিক এবং অংশীবাদী - তাই তাদের সম্পর্কে নৃশংসতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, যাবতীয় বীভৎসা ছিল ধর্ম অনুমোদিত।

Carl Brockelmann তাঁর পুস্তক History of Islamic People গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আরবীয়রা পৌত্তলিক হলেও তারা এক ঈশ্বর বা ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করত। এই যে এক ঈশ্বর বা পরমেশ্বর এর ধারণা হাজরে আসোয়াদ হয়ত তারই অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরেরই প্রতীক ছিল। মহম্মদীরা সর্বত্র সব কিছু মূর্তি ভেঙ্গেছে, কিন্তু হাজরে আসোয়াদ ভাঙ্গেনি। হজ্জ যারা করতে আসেন - তারা হাজরে আসোয়াদকে চুম্বন করেন। ভীড়ের কারণে অনেকে কাবার দেওয়ালে সেই চুম্বন সেরে নেন।



প্রাক ইস্‌লাম আরবদের দেব দেবী

নবী মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলামের আল্লাহ্ একশত ভাগ তার রসুলের উপর নির্ভরশীল। কেয়ামতের দিন বা শেষ বিচারের দিন ব্যতীত তার দর্শন পাওয়া যাবে না। প্রাক ইসলামী আরবের জনগণের কাছে আল্‌-লা সর্বদাই কাছে, স্বপনে জাগরণে। মহম্মদের প্রচারের আগে আরবীরা জানত না যে আল-লাকে ভয় করতে হবে। নবীই তাদের শেখালেন যে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে হবে নতুবা ঘোর বিপদ। তারা একথাও জানত না যে আল-লা সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এমন এক উচ্চতায় অবস্থান করেন যে, একজন মধ্যস্থ ব্যতীত তার সাথে যোগাযোগ করা যায় না।

প্রাক ইসলামী আরবীয়রা ছিল - বহুত্ববাদী, ঈশ্বরের বহুরূপে বিশ্বাসী, যে কোন একটি রূপকে পূজা করলেই সেই - সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আল-লার উপাসনা করা হয়। সেই জন্য কাবাগৃহে বহু দেব-দেবী ও পাথর পূজিত হত। আরবীয়রা কখনও ইব্রাহিম বা তার পুত্র ইসমাইলের কথা জানতই না। কাবাগৃহে যে ইব্রাহিম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল একথা মহম্মদই তাদের বললেন। প্রাক ইসলামী আরবীয়রা কখনই ধর্মান্ধ ছিল না। বরং গণতান্ত্রিক মনোভাবের ছিল।

মহম্মদের কাকা এবং অভিভাবক আবু তালিব যখন মৃত্যু শয্যায়, মক্কাবাসীরা তাকে বলেছিল যে আপনি আপনার ভাইপোকে বলুন যে সে যেন তার নিজের বিশ্বাস নিয়ে থাকে এবং আমাদের যেন আমাদের বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দেয়। তার সঙ্গে আমাদের বিরোধ তো ঐ 'বিশ্বাস' নিয়েই। কিন্তু মহম্মদ তীব্র আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন - আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নেই, আমাদের আল্লাতেই বিশ্বাস করতে হবে এবং তোমাদের ঐ সব পুতুলপূজা বন্ধ করতে হবে। কোর-আনে আরবীয়দের প্রাক ইসলামী কিছু দেব দেবীর নাম উল্লেখ আছে এবং বিষোদগার করা হয়েছে। সূরা বাকরার ২৫৭, ২৫৯ নং সূরা নিশার ৫২নং, সূরা-নাজম-এর ১৯নং এবং সূরা নূহর ২১ নং ইত্যাদি সূরা এ প্রসঙ্গে পড়া যেতে পারে।

ইসলাম এবং নবী মহম্মদ মূলত iconoclast মূর্তি পূজার বিরোধী। দেশে দেশে ইসলামী অভিযানে লুঠ, দাঙ্গা, হত্যা, ধর্মান্তরকরণ-এর সঙ্গে দেব দেবীর মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস একটি অতি আবশ্যিক বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কাজ। মহম্মদ নিজেও কাবায় তা করেছেন। First Encyclopaedia of islam এ এরকম দু'একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একটি এইরকম - তখনও ইসলাম প্রকাশ্যে আসেনি। একটি গোপন সংস্থা বা Secret Society র মত। আলী

এবং মহম্মদ কাবায় গেলেন। আলীর কাঁধে উঠে মহম্মদ মূর্তি গুলি ভাঙ্গতে চাইলেন। আলী তার ভার নিতে পারল না। তখন মহম্মদই আলীকে কাঁধে চাপালেন। আলী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এক ধাতব মূর্তি উপড়ালেন, মহম্মদের নির্দেশে ঐ মূর্তি সজোরে আছড়ালেন, মূর্তি টুকরো টুকরো হল। ওরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেন পাছে কেউ তাদের দেখতে পায় ইত্যাদি। (ঐ পুস্তক ৭ম খন্ড পৃ. ৫৬২। Hindu Temples what happened to them - Sitaram Goel পুস্তকের ৪০২ পৃ.)

তারপর যখন ইসলাম প্রকাশ্যে এল, ব্যাপক ভাবে ইসলামীকরণ হল - তখন মহম্মদ প্রকাশ্যেই কাবার মূর্তিগুলি ধ্বংস করেন। ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মূর্তিগুলি এক জায়গায় জমা করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। কেবল 'হুবাল'এর মূর্তিটা সিঁড়ির ধাপ হিসাবে ব্যবহৃত হল।

মহম্মদের মক্কা বিজয় ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে ইসলামের চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হল —

(১) যে কোন অজুহাতে মুসলিমদের দাঙ্গা, আক্রমণ চালিয়েই যেতে হবে - চূড়ান্ত বিজয় না আসা পর্যন্ত।

(২) ইসলাম কারুর সঙ্গেই আপোষ করবে না। অন্য যে কোন ধর্ম বা সংস্কৃতি - ইসলামের শত্রু। প্রথম সুযোগেই তাকে ধ্বংস করতে হবে।

কাবাগৃহের একটি মূর্তি বা প্রস্তরখন্ড মহম্মদ ভাঙ্গলেন না। বরং চুম্বন করলেন। হজ্জ করতে এলে সব মুসলমানকেই তা করতে হবে। সেই মূর্তি বা কালো প্রস্তরখন্ডকে - আল হাজার বা আল আসোয়াদ বলা হয়। ইব্‌নে আব্বাস-এর কথা অনুসারে, মহম্মদ তার অনুগতদের বলেছিলেন, আল্লাহ্ কোনদিন এই আল আসোয়াদকে উঠিয়ে নেবেন, সেদিন এর চোখ হবে, কান হবে এবং জিহ্বা হবে - এবং বলবে কে তাকে সব থেকে হৃদয়ভরে চুম্বন করেছিল। (First Encyclopaedia of Islam, Vol. VII, P. 147-148. Also Sitaram Goel's Book, Page - 408)

আল্-লা (Al-Lah) ছিলেন আরবীয়দের প্রধান দেবতা। এর অনেক নাম। এবং অনেক মানুষের নামও এর নামে, যেমন জায়েদ আলাহি, অব্দ্ আলাহি ইত্যাদি। অনেকটা ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে যেমন দেখা যায়, মহাদেব, মহেশ্বর, সদাশিব ইত্যাদি। আবার আলাহা নামেও ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। কোর-আনে অনেক আয়ত আছে যেগুলি প্রমাণ করে যে প্রাক ইসলাম যুগে আরবে আল্-হার প্রতিপত্তির সংবাদ পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবতাদের থেকে একেবারে পৃথক এক মহান অস্তিত্ব, তবে প্রাক ইসলামী আরবরা আল্-

লাকে ভয় করতে শেখেনি, শেষ বিচারের দিন বলতে কী, তা তারা জানত না। তাদের আল্‌-লা কোন স্বর্গেও অবস্থান করত না। আল-লা ছিল তাদের হৃদয়ে, তাদের সর্বত্র। তার কোন নির্দিষ্ট আকারও ছিল না।

দেব-দেবীর নামে নামকরণ আরবে সম্ভবতঃ খুব প্রচলিত ছিল। এবং একজন দেবতাকে বহুনামে সম্বোধন করার ভারতীয় রীতি সম্ভবতঃ আরবদেশেও ছিল।

ইসলাম অগ্রগতির ইতিহাস আমাদের জানাচ্ছে যে খোদ মহম্মদেরই অনেক নাম ছিল। মহম্মদ নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকেই গুরুত্ব দিতেন না এবং যার ফলে তিনি ক্রমশঃ তার আল্লাহ্‌র থেকেও 'বড়' হয়ে উঠছিলেন। তিনি ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের অন্য কোনও সড়ক তিনি হতে দেন নি। নিজেকে 'হাবিব আল্লা', আল-নবী, আর্‌-রসুল, খাতিম আল্‌ আনবিয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত করিয়েছেন। আল্লাকে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, আল্লায় আস্থা স্থাপনও যথেষ্ট নয়। তিনি আল্লাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে, তার নাম এবং আল্লার নাম এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করতে হবে - তবেই সে মুসলমান, তবেই সে বিশ্বাসী। অন্যথায় সে মুস্‌রিক, সে কাফির। কালক্রমে মুসলমানদের পরাক্রম যতই বাড়তে থাকল, মহম্মদও সব থেকে বড় হয়ে উঠলেন।

প্রাক-ইসলামী আরবীয়রা আল্‌-লা বলতে মহম্মদ সৃষ্ট আল্লাহ্‌কে বুঝতেন না। আর এক দেবতার নাম - আল্‌-মালিক। আল্‌-মালিক, নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে রাজার রাজা। অর্থাৎ অতিশয় ক্ষমতা ও গুণ সম্পন্ন। দেখা গেল ইসলাম প্রবর্তিত আল্লাহ্‌র একটি বিশেষণ হিসাবে এই 'মালিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ মালিক, মালেকে ইয়াওমেদ্দিন ইত্যাদি।

আল্‌-লাৎ — সূর্য দেবী। আরবীতে সূর্য স্ত্রী লিঙ্গ। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস আরবীয় এক দেবী হিসাবে আলিলাত্‌-এর উল্লেখ করেছেন। কোথাও কোথাও আল-লাত্‌কে দেবতাদের মাতা বলে, উল্লেখ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বৈদিক ব্যবস্থায় 'অদিতি' কে দেবতাদের মাতা (Mother of Gods) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-মানাত্‌ — সময়ের দেবী
আল্‌-উজ্জা — শ্রেষ্ঠ ক্ষতাশালিনী
সাম্‌স্‌ — উদীয়মান সূর্য
উদিয়মান সূর্যের ভৃত্য - আব্‌দ্‌-আস-শরিক
দুস্‌-সারা — চারণভূমির দেবতা

আল-থুরাইয়া, কুজাব, ওয়াদ, রুদা, জাদ, সাদ, মানাফ্, নাস্র্, আউফ্, হুশল ইত্যাদি। এব সব দেব দেবীদের মন্দিরও ছিল।

মূর্তি বিরোধীতা Iconoclasm ইসলামের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। আল্লার কোন আকার থাকবে না। তাই সেখানে যত ধর্মস্থান ও দেবদেবীর মূর্তি সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া এবং ঐ সব পাথর, ইঁট ইত্যাদি ব্যবহার করে মসজিদ নির্মাণ, মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে মসজিদে ওঠার সিঁড়িতে পুঁতে দেওয়া ইসলামের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, ইউরোপ (দক্ষিণাংশ) - ইত্যাদি সর্বত্র চার্চগুলিও ধুলিসাৎ হয়েছে। জরাথ্রুষ্টদের অগ্নি দেবতার মন্দির (ইরান) সমূহ ধ্বংস হয়েছে। ভারতবর্ষে তো অবর্ণনীয় ঘটনা সব ঘটেছে। এখনও কাশ্মীর, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এই সব ঘটনার শিকার রয়েছে।

এখন আর আফগানিস্তান, ইরাণ, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি সর্বত্রই হিন্দু মন্দির আর নাই। ইসলাম আসার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই ধ্বংস প্রাপ্ত।

ইসলাম ও আইন আদালত

এতসময় ধরে এতগুলি পৃষ্ঠা - যা আপনি পড়লেন, তা পুরোটাই ইতিহাসের ঘটনা। যে কোনজন ঔৎসুক্য নিয়ে নির্ভরযোগ্য কারুর ইতিহাস পড়লেই জানতে পারবেন।

এখন যা লিখতে চলেছি তা এখনও ইতিহাস হয়নি। তবে অন্ততঃ ৫০ বছর বয়স যার হয়নি, তিনিও এ বিষয়ে অবহিত নন। এ বিষয় মাত্র ২৮-৩০ বছরের পুরানো। বিষয়টি নিয়ে সাময়িক কিছু উদ্বেগ-উত্তেজনা তৈরী হলেও তা থিতিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে আর উচ্চবাচ্য হয়নি।

তবে যে প্রসঙ্গে এই পুস্তক লেখা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে এই ঘটনা এতই প্রাসঙ্গিক যে তা উল্লেখ না করলে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া হয় না।

ঘটনাটি প্রথমে দিল্লীতে, তারপর আমাদের এই রাজ্য - পঃ বঙ্গে চলে আসে। সময়টা ১৯৮৪-৮৫।

দিল্লীর হিন্দুরক্ষাদলের সভাপতি ইন্দুসাই শর্মা ও সম্পাদক রাজকুমার আর্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের (ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, আই. পি. সি.) ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে ঐ দুইজনের বিরুদ্ধে।

ভারতের দন্ডবিধি আইনের (১৮৬৩) ১৫৩-এ ধারায় বলা হয়েছে — Promoting enmity between different groups on grounds of religion,

race, place of birth, residence language etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony -

(1) Whoever

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote on grounds of religion, races place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or illwill between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or

(b) Commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religion, racial, language or regional groups or castes or communities and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility, or

(c) Organises any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity for any reason what so ever, causes or likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(2) Offence Committed in place of worship etc. - whoever commits an offence specified in sub-section(1) in any place of worship or any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

ঐ দন্ডবিধি আইনের ২৯৫-এ ধারা — Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting of religion and religious beliefs.

Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging religious feelings of any class of citizens of India,

by words, either spoken or written or by signs, or by visible represenation or otherwise, insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with five or with both.

[Indian Penal Code 1860. Sarkar. Vol-I, P. 360 and P. 707]

(খুব সংক্ষেপে) এই দুটি ধারায় যা বলা হয়েছে তার মোটামুটি অর্থ হল কথায়, লেখায় বা কাজে এমন কিছু করা যাবে না যা ধর্ম, ভাষা, জাত ইত্যাদিতে আঘাত করে, বিরোধ বাধায় এবং শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিনষ্ট করে, ঘৃণা তৈরী করে। শত্রুতা তৈরী করে ইত্যাদি। যদি কেউ করে সর্বোচ্চ তিন বছর জেল জরিমানা বা দুটোই হতে পারে।

কোন ধর্মস্থানে করলে জেল ৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে, জরিমানা হতে পারে।

ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ম, ভাষা, জাতি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঐ ধরণের কাজ করলে জেল এবং জরিমানা হবে।

এক কথায়, নিষ্ঠুরতা প্রচার, দাঙ্গার প্ররোচনা, শান্তি শৃংখলা ভঙ্গ, কোন ধর্মে আঘাত, নিন্দা, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা, অসূয়া তৈরী, অন্য জনের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত, অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর আঘাত, নিন্দা, ইত্যাদি অপরাধ-এর পর্যায়ে পড়ে। এবং ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারা অনুসারে ৩-৫ বছর জেল, জরিমানা দুটোই হতে পারে।

দিল্লীর ঐ দুই ভদ্রলোককে - ইন্দ্রসাঁই শর্মা ও রাজকুমার আর্যকে গ্রেপ্তার করা হল। কারণ তারা ভা. দ. বি. আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারা অনুসারে অপরাধী, অপরাধের বিষয়বস্তু হল —

তারা একটি প্রচারপত্র বিলি করেছেন (হিন্দী ভাষায়), ঐ প্রচারপত্রের শিরোণাম - 'দেশে দাঙ্গা বাধে কেন ?' বলা হয়েছে কোরাণে এমন সব আয়ত আছে - যা মুসলমানদের অন্য ধর্মের লোকেদের আক্রমণ করতে বলে, কোরাণ থেকে ঐ আয়তগুলিকে বাদ না দিলে এদেশে দাঙ্গা বন্ধ করা যাবে না।

ঐ প্রচারপত্রে কোরাণের বিভিন্ন সূরা থেকে ২৪টি আয়ত উল্লিখিত হয়েছিল। (পরিশিষ্টে সেগুলি উল্লিখিত হল)

গ্রেপ্তার হওয়া দু'জনকে দিল্লীর মেট্রো পলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হল। বিচারক ছিলেন জেড. এস. লোহাট। সরকার পক্ষ থেকেই মামলা হয়েছিল। সরকার পক্ষের উকিলবাবু দুই অভিযুক্তকে জেলে ভরার

জন্য উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েই বক্তব্য পেশ করলেন। অভিযুক্তের পক্ষ থেকেও উকিলবাবুরা যা বলা প্রয়োজন মনে করলেন, বললেন। বিচারপতি লোহাট তার রায় দিলেন ৩১ জুলাই ১৯৮৬। তিনি দুই অভিযুক্তকে সসম্মানে মুক্তি দিলেন।

বিচারপতি তার রায়ে যা বলেছেন তার সংক্ষেপিত বর্ণনা হল - যে ২৪টি আয়ত প্রচারপত্র (Poster)-এ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি আমি কোরাণ মজিদ-এর হিন্দী অনুবাদ (মহম্মদ ফারুক খান কৃত)-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। অনুবাদ ঠিকই আছে। ঐগুলি ছাপিয়ে প্রচার করার মধ্যে কোন দূরভিসন্ধি নাই। তাই আমি সরকারী উকিলবাবু উত্থাপিত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। সরকারী পক্ষে উত্থাপিত এ অভিযোগও মানা যাচ্ছে না যে প্রচারক / প্রকাশক ঐগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগে কোনও ভাবে আঘাত করেছেন। প্রকাশক বলতে চেয়েছেন যে ঐ সব আয়াত দাঙ্গার কারণ, ঐগুলি কোরাণ থেকে সরিয়ে রাখলে - দাঙ্গার কারণ থাকবে না। এটি প্রকাশকের সাজেস্‌শন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই বক্তব্যে একথা প্রমাণ হয় না যে মুসলমানদের ঘৃণা করা হয়েছে বা দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ তৈরীর চেষ্টা করছে।

দন্ডবিধি আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের মুক্তি দেওয়া হল।

হিমাংশু কিশোর চক্রবর্তী - ২০ জুলাই, ১৯৮৪ তারিখে পঃ বঙ্গ রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

চিঠির বক্তব্য ছিল ঃ ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত কোরাণে এমন কতকগুলি বাণী আছে যেগুলি নিষ্ঠুরতা প্রচার করে, দাঙ্গার প্ররোচনা দেয় এবং শান্তি বিঘ্নিত করে। এই সূত্রে কোরাণ থেকে তিনি ৩৭টি বাণী বা আয়ত উল্লেখ করেন। (পরিশিষ্টে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তিনি আরও ১৭টি বাণী বা আয়তের উল্লেখ করেন যেগুলি ধর্মের কারণে শত্রুতা, ঘৃণা ও বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের মধ্যে বদ মতলব তৈরী করে। (পরিশিষ্ট দেখুন)। এছাড়াও আরও ৩১টি বাণী বা আয়ত উল্লেখ করেন যেগুলি অন্য ধর্ম বিশ্বাসীদের প্রতি আক্রমণ মূলক (পরিশিষ্টে দেওয়া হল)

স্বরাষ্ট্রদপ্তরের সচিবের কাছে শ্রী চক্রবর্তী দাবী করেন যে, ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ (আগেই উল্লিখিত) ধারা অনুযায়ী ওগুলি অপরাধমূলক। তাই ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৯৫ ধারা অনুসারে আরবী এবং অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত কোরাণ বাজেয়াপ্ত করা হক।

স্বরাষ্ট্র সচিব পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার না করায় শ্রী চক্রবর্তী ১৯৮৪ সালের ১৪ আগষ্ট মাসে একটি রিমাইণ্ডার পাঠান। কিন্তু ছয়মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তিনি কোন উত্তর পেলেন না।

এই সময়ের মধ্যে শ্রী চাঁদমল চোপরার সঙ্গে শ্রী চক্রবর্তীর দেখা হয়। শ্রীচোপরা জৈন ধর্মাবলম্বী। শ্রী চক্রবর্তী সনাতনপন্থী হিন্দু।

দুজনেই গভীরভাবে কোরাণ পড়ছিলেন। শ্রীচক্রবর্তী পড়েছিলেন এই কারণে যে তাঁর মাথায় ঢুকছিল না, কী এমন ঘটল যে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের উপর এত অকথ্য নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিল। তারা পূর্ববঙ্গের মানুষ বহুকালই মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস করে অভ্যস্ত। কিন্তু তারা এক রাতের মধ্যে এতটা বদলে গিয়ে এত হিংস্র হয়ে উঠল কেন ? তারা মহিলাদের বে-ইজ্জত করল, ঘরে আগুন দিল, জিনিসপত্র লুটপাঠ করল, হিন্দু দেখতে পেলেই হত্যা করল, কিন্তু কেন ? তাদের এই ধররেণর অমানবিক তথা নৃশংসতার-ও অযৌক্তিকতার কারণ কি ? কোরাণ শরীফে বিশদভাবে অধ্যয়ন করে তার মনে হয়েছিল যে, বাংলাদেশে যে মুসলমানরা তাদের মত হিন্দুদের উপর এই ব্যবহার করেছে তারা তাদের ধর্মপুস্তক থেকে প্রেরণা পেয়েছে ও উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

শ্রী চোপরার বিশদভাবে কোরাণ পড়ার কারণ হিসাবে জানা গেছে যে তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় অহিংস। তার কাছে ধাঁধা হচ্ছিল এই ঘটনা যে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হিন্দু বিতাড়নের ঘটনা।

শ্রী চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করে শ্রী চোপড়া বুঝলেন যে - শ্রী চক্রবর্তীর ধারণা অমূলক ও কল্পিত নয়। সত্যই এমন সব বাণী কোরাণে আছে যা ভারতীয় দ. বি. আইনের ১৫৩-এ, ২৯৫-এ ধারা মোতাবেক অবৈধ এবং ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের ৯৫ ধারা প্রযোজ্য।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৯৫ ধারা — কতিপয় প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার এবং তজ্জন্য তল্লাশি পরোয়ানা ইস্যু করিবার ক্ষমতা **(Power to declare certain publications forfeited and to issue search warrant for the same)**

(১) যে ক্ষেত্রে

(ক) কোন সংবাদপত্র বা গ্রন্থ, বা

(খ) কোন দলিল

তাহা যেখানেই মুদ্রিত হউক না কেন, রাজ্য সরকারের নিকট এমন মনে হয় যে, উহাতে ভারতীয় দন্ডবিধির (১৮৬০ এর ৪৫ আইন) ১২৪ ক ধারা বা ১৫৬ ক ধারা বা ২৯২ ধারা বা ২৯৩ ধারা অথবা ২৯৫ ক ধারানুযায়ী

দন্ডযোগ্য কোন বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অভিমত জ্ঞাপনপূর্বক প্রজ্ঞাপন দ্বারা এইরূপ বিষয়বস্তু সম্পন্ন সংবাদপত্রের প্রত্যেক কপি এবং এইরূপ গ্রন্থের বা অন্য কোন দলিলের প্রত্যেক কপি সরকারের বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে পারেন এবং অতঃপর যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা ভারতের যে কোন স্থানে পরিলক্ষিত হউক না কেন, উহা বাজেয়াপ্ত করতে পারিবেন এবং যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানার দ্বারা সাব-ইন্‌স্পেকটারের নিম্নপদস্থ নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন, এইরূপ যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিবার এবং তল্লাস করিবার, যেখানে এইরূপ কোন প্রকাশনার কোন কপি বা এইরূপ কোন গ্রন্থ বা অন্য দলিলপত্র রহিয়াছে বলিয়া যুক্তিযুক্ত ভাবে সন্দেহ করা যায়।

(২) এই ধারায় এবং ৯৬ ধারায় —

(ক) 'সংবাদপত্র' এবং 'গ্রন্থ' বলিতে ১৮৬৭ সালের মুদ্রণ ও গ্রন্থ নিবন্ধন আইনে বর্ণিত একই অর্থ বুঝাইবে।

(খ) 'দলিলপত্র বলিতে' যে কোন চিত্রাঙ্কণ, অঙ্কণ বা আলোকচিত্র অথবা অন্য কোন দৃশ্যমান কল্পমূর্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) ৯৬ ধারার বিধান ব্যতীত এই ধরার আওতায় প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

(সূত্র ঃ বাসুদেব গাঙ্গুলী - ফৌজদারী কার্য্যবিধি ১৯৭৩)

শ্রী চোপড়া জনস্বার্থে কিছু একটা করার কথা ভাবলেন।

১৯৮৫ সালের ১৬ মার্চ তিনি পঃ বঙ্গ স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে একটি পত্র দিলেন, সেই পত্রে শ্রী চক্রবর্তী পত্রের উল্লেখ করলেন। তিনি লিখলেন যে, তার পত্রটিকে "Notice demanding Justice" হিসেবে বিবেচনা করা হক। তিনি আরও লিখলেন যে, সাত দিনের মধ্যে জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রী চোপড়ার পত্রেরও প্রাপ্তি স্বীকার হল না। ১৯৮৫ সালের ২৯ মার্চ তিনি ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারা মোতাবেক কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করলেন। তাঁর মামলার সহ-বাদি হলেন জনৈক শ্রী শীতল সিং।

রাজ্য সরকার গোয়েন্দা দপ্তরকে কাজে লাগল বাদীদের সম্পর্কে এমন কোন খবর পাওয়া যায় কি-না, যা মামলায় বাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

১৯৮৫ সালের ১০ মে তারিখে দি টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখল, গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে জানা গেছে যে চাঁদমল চোপড়া যে ঠিকানা দিয়েছেন, সেই

ঠিকানায় স্থায়ী ভাবে থাকেন না। তাঁর ঠিকানা ছিল ২৫ বড়তলা স্ট্রীট। ঐ ঠিকানায় না থাকলেও ঐ ঠিকানায় তার ঘর আছে। তার বয়স ৫৫। সহ বাদী শীতল সিং একজন প্রাক্তন সামরিক কর্মী, বয়স ৫০, হায়দ্রাবাদে থাকেন। কলকাতায় এলে ১নং সদরুদ্দীন স্ট্রীটে থাকেন - ঐটি আর্য সমাজের একটি মন্দির। দু'জনের কারুর বিরুদ্ধেই পুলিশের কাছে কোন আপত্তিকর খবর নাই।

শ্রী চাঁদমল চোপড়া - ২৯.০৩.৮৫

ঐ তারিখে পেশ করা শ্রী চোপড়ার রিট পিটিশনে, হিমাংশু কিশোর চক্রবর্তীর তোলা আয়ত বা বাণীগুলি ছিল। তবে আইনের ভাষায় সাজানো হয়েছিল।

১৯৮৫ সালের ১ এপ্রিল, বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীরের এজলাসে রিট দায়ের হল। তিনি ৮ এপ্রিল মামলা শুনবেন বললেন। কোন কারণে ঐ তারিখে মামলা না উঠে মামলা উঠল ১২ এপ্রিল। বিচারপতি আদেশ দিলেন যে প্রতিপক্ষ রাজ্য সরকারকে ৩রা মে তারিখের মধ্যে এফিডেবিট করে বক্তব্য জানাতে হবে এবং বাদী পক্ষকে ঐ জবাবের কাউন্টার এফিডেবিট জমা দিতে হবে ১৭ মে তারিখের মধ্যে। মামলার শুনানী হবে ২৭ মে ১৯৮৫।

রাজ্য সরকার এফিডেবিট জমা দিলেন। বললেন, যেহেতু কোরাণ একটি দৈবগ্রন্থ (Divine Book), কোন পার্থিব শক্তি এর বিচার করতে পারে না, কোন আদালতের ঐ বিচারের এক্তিয়ার নাই। বৃটিশ রাজ-এর সময় থেকে ভারতীয় দন্ডবিধি আইন বলবৎ আছে কিন্তু এতাবৎকালের মধ্যে ভারতের কোন আদালতে এই ধরণের কোন আবেদন পেশ হয়নি।

২রা মে শ্রীমতী খাস্তগীর তার এজলাসের মামলার তালিকা থেকে এই মামলাটি বাদ দিলেন। ৭মে পঃ বঙ্গের এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করলেন, অন্য কোনও বিচারপতির আদালতে মামলাটি তালিকাভূক্ত করতে। ১০মে প্রধান বিচারপতি এই মামলাটি বিচারপতি বিমলচন্দ্র বসাক-এর এজলাসে দিলেন।

এই সময় একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল। বিচারপতি খাস্তগীর বাদীদের কাউন্টার এফিডেবিট-এর তারিখ স্থির করেছিলেন ১৭মে । কিন্তু ১২ তারিখে মধ্য রাত্রে বা ১৩ তারিখের শুরুতে শ্রী চোপড়াকে জানান হল যে, যে তার মামলা ১৩ তারিখে বিচারপতি শ্রী বসাক-এর এজলাসে শুনানী হবে। শ্রী চোপড়া তখন কাউন্টার এফিডেবিটে ব্যস্ত। ১৩ তারিখ বিচারপতি বসাক বললেন যে রিট আবেদনটি নূতন করে তার কাছে পেশ করা হ'ক। শ্রী চোপড়া এর জন্য

একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। অপরদিকে ভারত সরকারের এটর্নি জেনারেল ও রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল বিবাদীপক্ষের হয়ে সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হয়ে আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী চোপড়া সময় চাইলেন। বিচারপতি আবেদন খারিজ করে দিলেন। বিবাদী পক্ষকে কী বলার আছে বলতে বললেন। ভারত সরকারের এ্যাটর্নী এবং রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন।

বিচারপতি বসাক মামলা তখুনিই খারিজ করলেন এবং কারণগুলি পরের কোন তারিখে জানাবেন বললেন।

নেপথ্যে ঃ বিচারপতি শ্রীমতী খাস্তগীর কেন মামলাটা ছেড়ে দিলেন, তা কখনও প্রকাশ হয়নি। তবে অনুমান করা যায় যে, (১) তাকে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল চূড়ান্ত হুমকী দিয়েছিল। (২) দেশের বিচার বিভাগের কোপে পড়েছিলেন তিনি, (৩) দুটোই।

৯ মে তারিখের দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় রিপোর্ট বেরাল যে, কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা হাইকোর্টে পেশ হওয়া কোরাণ নিষিদ্ধকরণের মামলায় হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ্যাটর্নি জেনারেলকে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী (অশোক সেন) কলকাতা যাচ্ছেন উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়ার জন্য।

দি টেলিগ্রাফ আরও লিখল যে, বিচারপতি খাস্তগীর রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন কোরাণ নিষিদ্ধ করা হবে না। হাইকোর্টের মুসলমান আইনজীবিরা বিশেষ সভা আহ্বান করে শ্রীমতী খাস্তগীরকে ধিক্কার দেওয়ার প্রস্তাব আনে, কিন্তু উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হল না।

দি টেলিগ্রাফ -১০ মে তারিখের কাগজে রিপোর্ট দিল যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক অনিল মুখার্জীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, মামলাটি রুজু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদালতের তা খারিজ করা উচিত ছিল - যেহেতু বিষয়বস্তুটি ছিল ধর্মীয়। তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেলকে এ বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।

দি স্টেটসম্যান পত্রিকার ১১মে তারিখের সংখ্যায় রিপোর্টে বেরিয়েছে যে, লোকসভাতেও একজন কংগ্রেস সাংসদ এবং একজন সিপিআই (এম) সাংসদ বিষয়টি তুলেছিলেন। অধ্যক্ষ বলরাম ঝাখর তাদের সঙ্গে একমত হন যে, বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নাকি বলেছেন, এমনিতেই দেশে সমস্যার অভাব নাই, তারপরে আবার একটি সমস্যা তৈরীর প্রয়োজন নাই। আইন

বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভরদ্বাজ বলেন যে, সরকারের নজরে বিষয়টি আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে।

দি টেলিগ্রাফ পত্রিকা তার ১৪ মের সংখ্যায় লিখেছে যে, পাকিস্তান সরকারের ধর্ম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মকবুল আমেদ খান বলেছেন যে কলকাতা হাইকোর্টে পেশ হওয়া কোরাণ মামলা একটি দৃষ্টান্ত যে ভারতে ধর্মীয় অসহনীয়তা কত গভীর। ভারতে সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্ম নিরাপদ নয়, ভারত সরকার ধর্ম সহনশীলতার বিষয়ে পাকিস্তানকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করুক। তিনি বলেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতার কারণে যদি কোরাণ নিষিদ্ধ হয় তবে হিন্দুদের সব ধর্ম পুস্তকও নিষিদ্ধ করতে হবে। মৌলানা কওসের কাজী নামে এক রাজনৈতিক নেতা অর্গানাইজেসন অফ ইসলামিক কনফারেন্স-এর চেয়ারম্যান শরীফুদ্দীন পীরজাদাকে বললেন সারা পৃথিবীর মসুলমানদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আনতে। তিনি পাক সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারকে অভিযোগ জানাতে বললেন এবং শুক্রবার প্রতিবাদ দিবস পালন করতে আবেদন করলেন।

মামলাটি বিচারপতি শ্রীমতী খাস্তগীর গ্রহণ করেছেন কি করেন নি এই নিয়ে বিরোধ হল। শ্রীমতী খাস্তগীর ও প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র বললেন, মামলা গৃহীত হয়নি, অপরদিকে এ্যাডভোকেট জেনারেল ও বেশ কিছু উকিলবাবু বললেন, হ্যাঁ গৃহীত হয়েছে, অন্যথায় এফিডেভিট, কাউন্টার এফিডেভিট-এর কথা উঠে কেন ? শ্রীমতী খাস্তগীর বললেন যে, তিনি কোন আবেদন খারিজ করার পক্ষপাতী নন।

যদি আবেদনটি গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি 'বিচারাধীন' হিসাবে বিবেচ্য। কোন বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে কারুর মন্তব্য করা মানেই আদালত অবমাননা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নানারকম মন্তব্য করেছেন এবং কার্য্যতঃ আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন। কিন্তু এসব প্রসঙ্গ এল না।

বিচারপতি বসাক এমনভাবে ১৩মে আদালতে বিচারকের ভূমিকা পালন করলেন যেন, মামলাটি ঐ দিনই পেশ হয়েছে। রাজ্য সরকার যে এফিডেবিট করেছিল তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হল এবং ভাবটা হল এই যে, মামলা ঐ দিনই উঠল (১৩মে) ঐ দিনই বিচার হল। ঐদিনই খারিজ হল। খারিজের কারণ পরে জানান হবে বলা হল।

বিচারপতি বসাক, বিচারপতি শ্রীমতী খাস্তগীরকে রীতিমত গালাগালি

করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে গিয়ে দারুণ রকম বিপর্যয় আহ্বান করা হচ্ছিল।

ঢাকায় জামাত-ই-ইসলামী মিছিল করল ধিক্কার জানিয়ে। এদেশের রাঁচিতে মুসলমানদের মিছিল হল। কালো পতাকা, সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বনি। শ্রীনগরে মুসলমানরা প্রতিবাদে অনেক কিছুই করল।

টাইম্‌স্‌ অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ড. রফিক জাকেরিয়া কোরাণের প্রশংসা করে পরপর তিনদিন লেখা লিখলেন।

চাঁদমল চোপড়া - ১৮ই জুন ১৯৮৫ ঃ

এতকান্ড হওয়ার পরও শ্রী চোপড়া আদালতের পিছন ছাড়লেন না। তিনি তার বক্তব্য সম্পর্কে দৃঢ় ছিলেন। তিনি এও বুঝেছিলেন যে কারণেই হ'ক, আদালত তার আবেদনের সঠিক বিচার এবং উচিত মূল্যায়ন করেন নি। তাই বিচারপতি শ্রীবাসক মামলা খারিজ করার যে সব কারণ দর্শে ছিলেন, সেই প্রসঙ্গে ৮টি ভ্রান্তি দেখিয়ে একটি পুর্নবিবেচনার আবেদন করলেন ১৮ জুন ১৯৮৫।

২১ জুন বিচারপতি বসাকের এজলাসেই পুনর্বিবেচনা (Review) আবেদন পেশ হল। তিনি সেই দিনই মামলা খারিজ করলেন পদ্ধতিগত (technical) ত্রুটি দেখিয়ে। বিষয়বস্তুর বিচার হল না।

বিচারপতি শ্রী বসাক - ১৭মে ১৯৮৫

বিচারপতি শ্রীবসাক ১৩মে মূল মামলাটি খারিজ করলেন আর রিভিউ পিটিশন খারিজ করলেন ২১ জুন। ১৩মে মূল মামলা খারিজ করে দিয়ে বলেছিলেন - পরে কারণ জানাবেন। ১৭ মে তিনি তাঁর রায় - যুক্তি সহ জানালেন। তিনি রায়ে লিখলেন - (সংক্ষেপিত)

(১) এই মামলাটি ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারা মোতাবেক করা হয়েছে এবং আবেদন করা হয়েছে যে কোরাণ এবং তার যাবতীয় ভাষায় অনুবাদ বাজেয়াপ্ত করা হ'ক।

(২) বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর মামলাটি গ্রহণ করেছিলেন এবং এফিডেবিট ও কাউন্টার এফিডেবিট-এর আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি এই মামলাটি শুনতে অসম্মতি জানান। প্রধান বিচারপতি মামলাটি আমায় বিচার করতে দেন। ১নং বাদী নিজে উপস্থিত হয়ে রুল জারীর আবেদন করেছেন।

(৩) রাজ্য সরকারের পক্ষে এ্যাডভোকেট জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল উপস্থিত হয়েছেন।

(৪) বাদী কোরাণের ইংরাজী অনুবাদের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরেছেন

এবং বলেছেন যে ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারা বর্ণিত মতে অপরাধমূলক এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৯৫ ধারা মোতাবেক কোরাণ-এর সব ভাষার সব কপি বাজেয়াপ্ত করা হ'ক। তিনি বলেছেন যে, কোরাণ দেবদেবী মূর্তি ধ্বংস করতে উৎসাহ দেয়, হিংসা প্রচার করে। এটি নৈতিকতা বিরোধী। অমুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করে, ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মকে অপমান করে, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরী করে।

(বিচারপতি তাঁর রায়-এ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৯৫ ধারা, দন্ডবিধি আইনের ১৫৩-এ, ২৯৫ এবং ২৯৫-এ ধারা তুলে ধরেন)।

বিচারপতি লিখেছেন —

(৫) অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে, কোরাণ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। বাদীর আবেদন মত কাজ করলে, কোরাণ লুপ্ত হয়ে যাবার অবস্থা হয়। ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ২৯৫ ধারা মোতাবেক সেটি একটি অপরাধ। ঐ আইনের ১৫৩-এ এবং ২৯৫-এ ধারা প্রযোজ্য নয়। তিনি সুপ্রীম কোর্টের একটি মামলার নজির দিলেন। বীরভদ্রম বনাম রাজস্বামী নাইকার এবং অন্যান্য এ. আই. আর. ১৯৫৮ এস. সি. পৃ. ১০৩২-১০৩৫ ৭নং অনুচ্ছেদ।

(বিচারপতি বসাক সেই মামলার রায়-এর কপি উদ্ধৃত করেছেন।—

অ্যাডভোকেট জেনারেল আরও বলেন যে, কোরাণ দীর্ঘদিনের। আজ পর্যন্ত কোন অভিযোগ উঠেনি। যেহেতু এটি একটি ধর্ম, আদালতের এ বিষয়ে বিচারের একতিয়ার নাই। এটি একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা এবং উদ্দেশ্য হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা। তিনি একটি নজির হিসাবে - পাবলিক প্রসিকিউটার বনাম পি. রামস্বামী মামলাটির উল্লেখ করেন। সি. এল. জে. ১৯৬৬(১) , পৃ. ৬৭২

(৬) কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী এস. কে. ব্যানার্জী অ্যাডিশন্যাল সলিসিটর জেনারেল, অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য সমর্থন করলেন। তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ৪৪৪-৪৪৫ পৃ. উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন যে কোরাণ হল মুসলমান ধর্মের ভিত্তি। আদালতে মামলা চলে না। বাদীর আবেদন শুধু মুসলমান ধর্ম নয়, সব ধর্মের পক্ষেই অপমান। তিনি আরও বললেন, প্রসঙ্গবিহীনভাবে কয়েকটি আয়ত তুলে ধরে আদালতের কাছে বিচার চাওয়া যায় না। তিনি কলেটের লেখা - দি লাইফ এন্ড লেটার্স অফ রামমোহন রায় থেকে কিছু অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেন।

(প্রসঙ্গ বিহীন উল্লেখ অর্থে বলা হয়েছে Out of Context - লেখক)

তিনি কৃষ্ণ সিং বনাম মথুরা এবং অন্যান্য - এ. আই. আর. ১৯৮০ এস. সি. পৃ. ৭০৭-৭১২, ১৭নং অনুচ্ছেদ, নজির হিসাবে উল্লেখ করলেন। ফৈজি এবং মুল্লার মহামেডান ল থেকেও কিছু নজির দিলেন। নজির হিসাবে আরও উল্লেখ করলেন - রামজীলাল মোদি বনাম ইউ. পি. রাজ্য সরকার। এ. আই. আর. ১৯৫৭, এস. সি. পৃ. ৬২০, অনুচ্ছেদ - ৯। এরপর এ্যাটর্নি জেনারেল ভারতের সংবিধানের প্রিএম্‌ব্‌ল্ (ভূমিকা) তুলে ধরলেন। সংবিধানের ২৫নং ধারা তুলে ধরলেন।

(বিচারপতি বসাক তাঁর রায়-এ প্রিএম্‌ব্‌ল্ এবং সংবিধানের ২৫নং ধারা - উদ্ধৃত করেছেন - লেখক)

(৭) এ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে সংবিধানের ঐ ভূমিকা এবং ঐ ২৫ ধারা অনুযায়ী আদালতের রায় দেওয়ার একতিয়ার নাই।

Preamble : We, the People of India having solemnly resolve to constitute India into a Soverign, Socialist, Secular Democratic Republic and to secure to all citizens, Liberty of thought, expression, belief, faith and worship.

Article 25(1) Subject to Public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.

(৮) এছাড়াও এ্যাটর্নি জেনারেল একটি নজির দিয়েছেন হল্‌স্ বেরীর - ল অফ্ ইংলন্ড বই থেকে। নজির হিসাবে বন্ধু মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত সরকার মামলার রায় তুলে ধরেন। ১৯৮৪(৩) এস. সি. ১৬১-২৩১। অনুচ্ছেদ ৫৯-৬৭

বিবাদী পক্ষের সওয়ালের জবাবে বাদী সেই পুরানো কথাই বললেন।

রায় —

(১) কোরাণ মুসলমান ধর্মের মূল ভিত্তি। অন্যান্য ধর্মের মত এও বলে যে এটিই একমাত্র সত্য ধর্ম, যারা এই ধর্ম অনুসরণ করে না তারা ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত নয়।

(২) বীরভদ্র চেট্টিয়ার বনাম রামস্বামী নাইকার মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট বলেছেন যে বাইবেল, গ্রন্থ সাহেব-এর মত কোরাণ একটি পবিত্র গ্রন্থ। মুসলমানরা একে পবিত্র মনে করে। এখানে ঈশ্বরের নাম আল্লাহ্।

(৩) এনসাইক্লোপিডিয়া অনুসারে কোরাণ পবিত্র গ্রন্থ, এতে ৮০ হাজার শব্দ আছে, আরবী ভাষায়, ১১৪টি সূরা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের। প্রথম সূরা ঈশ্বরের

প্রার্থনা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, তিনি হয় নিজে বলেন, কখনও উত্তম পুরুষে কখনও বলান, একেশ্বরবাদীতার কথা আছে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে।

(৪) কোরাণ হল ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত। মানুষের বেঁচে থাকার - সত্য পথ কোরাণে দেখান হয়েছে বলে মুসলমানরা মনে করেন।

(৫) মুসলমানদের কাছে কোরাণ হল - ঈশ্বরের বাণী। এই বাণী অনেক মুসলমান মুখস্থ রাখেন।

(৬) কোরাণের কোন কোন আয়তের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়। দি লাইফ এ্যান্ড লেটারস্ অফ রাজা রামমোহন পুস্তকে দেখানো হয়েছে যে রামমোহন উদ্ধৃত দুটি আয়ত আধুনিক পন্ডিতরা ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোরাণের নবম সূরার ৫নং আয়ত সকলের হত্যার কথা বলেনি, সেই অমুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করছিল।

(৭) কোরাণের কোন পার্থিব সূত্র নাই। নবীর মৃত্যুর পর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তা সংকলিত হয়েছে।

(৮) প্রসঙ্গ বহির্ভূত (Out of Context) ভাবে উল্লিখিত কয়েকটি বাণীকে সমগ্র কোরাণের মূল বক্তব্য বিষয় বলে ধরে নেওয়া যায় না।

(৯) আমার মতে কোরাণ একটি পবিত্র গ্রন্থ বিধায় এবং ফৌজদারী আইনের ২৯৫ ধারা অর্থের আওতার মধ্যে এসে যাওয়ায় এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে ২৯৫-এ ধারা প্রযোজ্য নয়। ২৯৫-এ ধারা অনুসারে-ব্যবস্থা নিতে গেলে ২৯৫ ধারায় কোরাণ যে মর্যাদায় আছে সেটাই অস্বীকার করতে হয়।

(৮) সুপ্রীম কোর্ট, রামজী লাল মোদি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলার রায়ে বলেছেন, যে কোন অপমান বোধক কাজ বা অপমান বোধক কাজের চেষ্টাকেই ২৯৫-এ ধারার মধ্যে আনা যায় না। ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে এমন প্রমাণ চাই। অনিচ্ছাকৃত ভাবে, বদমতলব না নিয়ে যদি কেউ কোন ধর্ম সম্পর্কে কিছু অপমানজনক কাজ করে, তবে তা ২৯৫-এ ধারায় বিচার্য্য হয় না। প্রসঙ্গবিহীনভাবে (Out of Context) এখান থেকে ওখান থেকে কিছু কথা তুলে দিয়ে অভিযোগ জানালেই মূল বিষয়ের কিছু পরিবর্তন ঘটে না।

(৯) এ্যাটর্নি জেনারেল ঠিকই বলেছেন যে, এরকম কিছু করলে তা সংবিধান বিরোধী হয়ে যাবে। সংবিধানের প্রিএম্‌বল্ এবং ২৫নং ধারা আমি উল্লেখ করেছি।

(১০) কেশাবানন্দ বনাম কেরালা, এ.আই.আর. ১৯৭৩ এস.সি. পৃ.

১৪৬১তে বলা হয়েছে - প্রিএম্‌ব্‌ল্‌ সংবিধানের অংশ বিশেষ। এটা মাথায় রাখতে হবে।

(১১) আমার মতে আবেদনকারীর আবেদনের মত কিছু করলে তা সংবিধানের প্রিএম্‌ব্‌ল্‌ ও ২৫নং ধারা বিরোধী হবে। মুসলিম ধর্ম কোরাণ বিহীন অবস্থায় থাকতেই পারে না। আবেদনকারীর আবেদন মত ব্যবস্থা নিলে কোরাণকেই লুপ্ত করতে হয় যার অর্থ মুসলমান ধর্ম লুপ্ত করা। কোরাণ, বাইবেল, গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি ধর্মপুস্তক নিয়ে আদালত বিচার করতে পারে না।

(১২) হল্‌স্‌ বারীর ফরেন রিলেসন্‌স্‌ পুস্তকে বলা হয়েছে, চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার, একক ভাবে, কারুর সঙ্গে, বা দলবদ্ধভাবে, ব্যক্তিগত ভাবে বা প্রকাশ্য স্থানে পালন করা যায়। আমার মতে আবেদনকারীর আবেদন মানলে কিছু জনের ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুন্ন হবে।

(১৩) এই ধর্ম পুস্তক দীর্ঘকাল ধরে আছে এবং চলছে। অদ্যাবধি এর কেউ কোন বিরোধ করে নি।

(১৪) এই কারণে আমি মনে করি না যে ১৫৩-এ ধারা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই পুস্তক সম্প্রীতি রক্ষার বিরোধী নয়। কোরাণের কারণে কোথাও শান্তি ভঙ্গ হয় নি। আমার মনে হয়, এই আবেদনের মাধ্যমে আবেদনকারী মুসলিম ধর্মকে অপমান করেছে বা অপমানের চেষ্টা করেছে। ২৯৫-এ ধারা প্রযোজ্য নয়। বিবাদী পক্ষ যে অভিযোগ করেছেন যে আবেদনটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত - তা অগ্রাহ্য করার মত নয়।

(১৫) এ্যাটর্নি জেনারেল ঠিকই বলেছেন যে, জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া প্রযোজন। সংবিধানের ২২৬ ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাইকোর্টকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে। সংবিধানের ৩২ ধারায় থেকেও এ ধারা অনেক ব্যাপক। দেওয়ানী আদালতে যে সব প্রশ্নের মীমাংসার এক্তিয়ার নাই, হাইকোর্টকে সেই সব বিষয় দেখতে হয়, তাই এটা আদালতের কর্তব্য, জনস্বার্থ মামলা গ্রহণের আগে খুবই সতর্ক হতে হবে, বিশেষ করে যখন বিষয়টি গভীর ভাবে জনস্বার্থ সম্পর্কিত। বন্ধু মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত সরকার মামলায় বিচারপতি জে. পাঠক যা বলেছিলেন, এক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য। এই মামলার প্রসঙ্গটি সংখ্যালঘু মানুষদের ধর্মীয় ভাবনার প্রসঙ্গ। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও লক্ষ লক্ষ মানুষের ধর্মীয় ভাবনা জড়িত। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। আবেদনটি গৃহীত হয়েছে প্রাথমিকভাবে এই সব দিকে লক্ষ্য না রেখেই (শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীরকে উল্লেখ করে বলা হল - লেখক)। আদালতের খুবই সতর্ক হওয়া

প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় সস্তায় হাততালি পাওয়া হয়ত যাবে কিন্তু দেশে সম্প্রীতি নষ্ট হবে। হাইকোর্টকে এই অস্বস্তিতে না ফেলাই উচিত ছিল। আবেদনটি সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করা দরকার ছিল (শ্রীমতী খাস্তগীরই লক্ষ্য - লেখক)।

(১৬) উপরে উল্লিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে আমি মনে করি যে, আদালতের রিট আবেদন গ্রহণের এক্তিয়ার ভুল ভাবে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। এই মামলার প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতাই দেখান যায় নি। আবেদনকারী যে প্রতিকার দাবী করেছেন, আদালতের সে একতিয়ার নাই।

(১৭) এই সব কারণে আবেদনটি খারিজ করা হল।

(১৮) এ্যাটর্নি জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল যেভাবে মামলাটির জবাব দিয়েছেন, আমি তার প্রশংসা করি।

আমাদের কথা —

আমরা সাধারণ মানুষ আইন মেনে চলায় অভ্যস্ত। নিজেরা মানি, আর চাই অন্যেরাও আইন মেনে ভদ্রভাব চলুক। আদালতের প্যাচ পাজার আমাদের বোধগম্য নয়। যারা আইন বোঝেন, আইন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান, কাজ করেন - তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

কোরাণে কিছু ভাল থাক বা মন্দ থাক আইন তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কারণ কোরাণ, দাবী করা হয়, ঈশ্বর প্রদত্ত। ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৫৩-এ বা ২৯৫-এ যেটির কথাই বলি না কেন - আইনের ভাষার কাঠামো থেকেই বোঝা যায় যে আইনটি মানুষের জন্য। দুটি ধারাই শুরু হয়েছে - 'Whoever' শব্দটি দিয়ে। এই শব্দ মানুষকেই বোঝায় - ঈশ্বরকে নয়। মাননীয় বিচারপতি এই একটি যুক্তি দেখিয়ে দিলেই আবেদনকারী ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। সত্যিই আইনটি - মানুষ (Whoever) কেই লক্ষ্য করেই বলা। তাই কোরাণের কোন বাণী আবেদনকারীর কথা মত হিংস্র, অমানবিক, হত্যার প্ররোচনা দেয়, অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে ইত্যাদি অভিযোগ অবান্তর। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় না - যেহেতু ঈশ্বর Whoever নন।

অনেকেই বলবেন, যারা ধর্মপুস্তকাদি নিয়ে পড়াশোনা করেন, যে, ঈশ্বর এবং আল্লাহ্ বোঝাতে একই শক্তিকে বোঝান হয় না। আল্লাহ্ শব্দের কোন প্রতিশব্দ আছে বলে আমার তো মনো হয় না। ঈশ্বর চরিত্র যে ভাবে তার অনুগামীরা চিত্রিত করেছেন, আল্লাহ্র অনুগামীরা তাদের আল্লাহ্র চরিত্র সেভাবে দেখিয়েছেন, তার মধ্যে গরমিল আছে কাজের, বোঝানোর এবং বোঝার। সুবিধার জন্য আমরা ঈশ্বর এবং আল্লাহ্ সমার্থক ধরে নিয়ে থাকি। কিন্তু আল্লাহ্ বললে যেমন ঈশ্বর বোঝায় না, ঈশ্বর বললে তেমনি আল্লাকেও বোঝায় না।

আবার একথাও সমালোচকরা বলেছেন, এই প্রবন্ধে তাদের সেই কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সব কথা নবী মহম্মদ নিজেই বলেছেন, আল্লাহ্ শব্দটি কেবল Euphimism বা কথার কথা বা কথার অলংকার মাত্র। তাদের কথা ঈশ্বর রক্তপাত পছন্দ করেন না।

ঈশ্বর কী পছন্দ করেন আমরা জানি না। আর সমালোচকদের কথা অনুসারে যদি ধরেও নি যে আল্লাহ্ Euphimism, নবী মহম্মদই আসল ব্যক্তি, তা হলে Whoever শব্দটি প্রাসঙ্গিক হয়, আল্লাহ্র ক্ষেত্রে যা প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু Whoever-এর সঙ্গে ব্যক্তি নবী মহম্মদ, মানুষ মহম্মদকে পাওয়া গেলেও, ১৪০০ বছরের আগের মানুষটিকে আজকের আদালতে কোথায় পাওয়া যাবে ? বিশেষকরে ১৮৬০ সালের আইনের আওতায় ? ফলে, ঐ আবেদনকারী তার আবেদনমত প্রতিকার পেতে পারেন না।

কিন্তু একথা আদালতও মানবেন এবং অন্যান্যরাও মানবেন যে, কোরাণের অনেক বাণী, যার মধ্যে কিছু এই মামলায় উল্লিখিত হয়েছে, সমস্ত মানুষ মেনে নিতে পারেন না। যে নিষ্ঠুরতার ইংগিত আছে তাও সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না, নয়ও। কিন্তু তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায় না। যেহেতু আদালত ঐ Whoever পর্যন্ত দৌড়াতে পারে, তার উপরে বা তার বেশী নয়।

তাহলে, ঐ সব বাণী বা আয়ৎ যাদের পছন্দ নয় বা যারা উদ্বেগাকূল হচ্ছেন, বা আতংকিত হচ্ছেন, তাঁরা কী করতে পারেন ? তারা এই টুকুই পারেন যে, আর কেউ যদি এই মনোভাবে থাকেন তাকে বা তাদের খোঁজ করা, তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। যে আতংক বা উদ্বেগ তারা অনুভব করছেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তা হালকা করা, নিজেদের সংগঠিত রাখা - যদি কখনও তাদের সেই কল্পিত আতঙ্ক বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দেখলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, প্রতিবাদ করতে পারেন।

কিন্তু এই পরামর্শ দেওয়ার জন্য এই প্রবন্ধ নয়। মাননীয় বিচারপতি বসাক যে রায় দিয়েছেন, আমার সাধারণ বুদ্ধিতে তার কিছু ফাঁক ফোকর দেখছি। বিচারপতি যেন কোথাও আমাকে ফাঁকী দিয়েছেন। সেইগুলিই তুলে ধরছি —

(১) আবেদনকারীর আবেদনে কোথাও বলা হয় নি যে, কোরাণ মুসলিমদের ধর্ম পুস্তক নয়। একথারও প্রশ্ন তোলা হয়নি যে, মুসলিমরা কত গভীর ভাবে কোরাণ বিশ্বাস করে। যে প্রশ্নটি মৌলিক ছিল, তাহল কোরাণ বিশ্বাসীদের মধ্যে কী তত্ব ঢোকাচ্ছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসীরা, বিশ্বাসীদের কাছ থেকে কী ব্যবহার আচরণ প্রত্যাশা করবে।

(২) আগেই বলেছি যে, বিচারক যদি শুরুতেই বলে দিতেন যে, কোরাণ

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, Whoever বলতে কোরাণ প্রণেতাকে বোঝায় না তাহলেই চুকে যেত। তিনি বলেছেন, কোরাণ ধর্মগ্রন্থ। আদালতের তা বিচারের এক্তিয়ার নাই। এর থেকে Whoever যুক্তিটা আরও বেশী Rational বলে মনে হয়। যাইহোক, আদালতের এক্তিয়ার নাই - মেনে নেওয়ার পরে তিনি আরও দু তিনটি কথা বললেন, যার জন্য আমাকে এই আলোচনায় আসতে হচ্ছে।

(৩) তিনি বলেছেন যে, প্রসঙ্গ বহির্ভূত (Out of Context) কয়েকটি বাণীর উল্লেখ, সমগ্র কোরাণের পরিচয় বহন করে না। একেবারেই ঠিক কথা। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হতে পারে না। কিন্তু বিচারপতি তার রায়-এ একটাও উদাহরণ দেন নি তার এই কথা প্রমাণ করতে যে বাণীগুলি প্রসঙ্গ বহিভূর্ত।

আয়ত বা বাণীগুলি পড়লে একটি বিষয়তো পরিষ্কার হয় যে, ধর্মগ্রন্থটি তার অনুগামীদের কী বিশ্বাস করতে বলছে এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কী ব্যবহার করতে বলছে। তাহলে প্রসঙ্গ বহির্ভূত হল কী করে ? আরও একটি বিষয় বিচারপতি বসাক হয়ত খেয়াল করেন নি যে, কোরাণ ধর্মগ্রন্থটি যেভাবে সংকলিত হয়ে আমাদের সামনে এসেছে - সেই ভাবে অর্থাৎ সেই ক্রমে অবতীর্ণ হয় নি। যেক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে সে ক্রমে আমাদের কাছে আসেনি পুস্তকাকারে। উদাহরণ হিসেবে বলি যে, সূরা ফাতিহা, কোরাণ গ্রন্থে আমরা একনম্বর সূরা হিসাবে পাই। কিন্তু ঐ সূরা প্রথমে নাযেল হয়নি। প্রথমে যে সূরা নাযেল হয়েছিল তা হল, সূরা নং ৯৬-র প্রথম ৫টি আয়ত।

(৪) বিচারপতি ঠিকই বলেছেন যে, এদিক ওদিক থেকে প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে তুলে আনা কয়েকটি বাণী সমগ্র কোরাণের পরিচয় নয়। কিন্তু বিচারপতি বলেন নি যে, আবেদনকারী যে বাণীগুলি উল্লেখ করেছেন, সেই বাণীগুলির বক্তব্য অস্বীকার করে ঐ ধর্মগ্রন্থ অন্য কোন বাণী আছেন কিনা। প্রসঙ্গ বহির্ভূত ভাবে ঐ রকম কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত হলে তো আবেদনকারীর উদ্ধৃত বাণীগুলি গুরুত্ব হারাত।

(৫) বিচারপতি বলেছেন যে, কোরাণের কারণে অদ্যাবধি কোন শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন আশংকা করার কারণ নাই।

বিচারপতি কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই মন্তব্য করেছেন, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে ইতিহাস অধ্যয়ন করে যা জেনেছি তাতে বিচারপতির বক্তব্য সমর্থন করতে পারি না।

৭১২ খৃ. মহম্মদ ইব্‌নে কাসিম

৯৭৭-৭৮ খৃ. সবুক্তগীন

৯৯৭-১০৩০ খৃ. গজনীর সুলতান মামুদ

১১৭৩-১২০৬ খৃ. চেঙ্গিস খান, মোহম্মদ ঘুরি

১২৯৬-১৩১৬ খৃ. আলাউদ্দিন খিলজী

১৪৯৯ - তৈমুর লঙ

১৫১৯-১৫৩০ খৃ. বাবর

১৬০৫ - ১৭০৭ খৃ. জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব

এছাড়াও এক একটি রাজ্যের এক একজন নবাব বা সুলতান - যা করে গেছেন এবং কোন উদ্দীপনায় করেছেন - তা সমসাময়িক ইতিহাসকাররা - আরবী, ফার্সী ভাষায় বই লিখে জানিয়ে গেছেন। স্যার এইচ. এম. ইলিয়ট এবং জন ডওসন ঐ সব ভাষায় ইতিহাস পুস্তকগুলির ইংরাজী করে পুস্তক প্রকাশ করেছেন ৮ খন্ডে - History of India as told by its own historians.

(৬) মাননীয় বিচারপতির সামনে - ১৯৪৬ সালের দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর উদাহরণ ছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের পালিয়ে আসা / তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ছিল।

(৭) মাননীয় বিচারপতি ভারতবর্ষে দীর্ঘ হাজার বছরের মুসলমান নবাব সুলতানরা হিন্দুদের জন্য 'জিম্মি' বলে একটি Social Status-এর জন্ম দিয়েছিলেন কেন, সে বিষয়টিও ভাবতে পারতেন।

যাইহোক, বিচারপতি যা বিচার করে দিয়েছেন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অবশ্যই মান্য। কিন্তু বেশ কতকগুলি প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে গেছেন এবং ইতিহাস অস্বীকার করে কিছু অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছেন।

১২ তারিখ মাঝরাতে নোটিশ দিয়ে ১৩ তারিখে বিচারে বসেছেন। আবেদনকারীকে প্রস্তুতির কোন সুযোগ দেন নি। অপর পক্ষকে পড়ে শুনে প্রস্তুত হয়ে আসতে সুযোগ দিয়েছেন।

বিচারপতির দেওয়া রায় মান্য করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু একথাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এ রায় প্রভাবিত, এ রায় ইতিহাসকে অস্বীকার করেছে। কোরাণ ধর্মগ্রন্থ, আদালতের বিচার্য এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না - Whoever বলতে ব্যক্তি মানুষকে বোঝায়, নিরাকার আল্লাহ্‌কে বোঝায় না। তাই মামলা খারিজ - এই ভাবে Summmarily reject করলে অনেক যুক্তিগ্রাহ্য হত যে যুক্তি, যে Rationality আমরা মহামান্য ন্যায়ালয় ও ন্যায়াধীশদের কাছে প্রত্যাশা করি।

(সূত্র ঃ ঐ মামলার রিট পিটিশন এবং মাননীয় বিচারপতি বি. কে. বসাক-এর রায়।)

পরিশিষ্ট - ১

শ্রী ইন্দু সাঁই শর্মা - শ্রী হিমাংশু শেখর চক্রবর্তী ও শ্রী চাঁদমল চোপড়া কোরাণের যে আয়তগুলি উল্লেখ করেছিলেন —

ক) নিষ্ঠুরতার প্রচার, দাঙ্গার প্ররোচনা, শান্তিভঙ্গ

খ) ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে শত্রুতা, ঘৃণা, অসূয়া - বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে

গ) অন্যান্য ধর্মের প্রতি অসম্মান এবং অন্য ধর্ম বিশ্বাসীদের প্রতি অপমান।

সূরা ২ — সূরা বাকারা (গাভী), আয়ত - ১৫৪, ১৯১, ১৯৩, ২১৬, ২২১

সূরা ৩ — ইমরান (ইমরানের বংশধর), আয়ত - ২৮, ৮৫, ১৪২, ১৫৭, ১৫৮

সূরা ৪ — নিসা (নারীগণ), আয়ত - ৬, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১০১, ১২৫, ১৫৭, ১৬৯-১৭১

সূরা ৫ — মায়েদা (খাদ্যভরা পাত্র), আয়ত - ১৭, ১৮, ৩৭, ৬৪, ৭২, ১১৬-১১৮, ১৪৪

সূরা ৬ — সূরা আনয়াম (গবাদি পশু), আয়ত - ২২-২৩, ৪০-৪১, ১৪৮

সূরা ৭ — আ রাফ (জন্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান), আয়ত - ১৭৩

সূরা ৮ — আনফাল (আল্লার পথে যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী), আয়ত - ১২, ১৩, ১৫-১৮, ৩৮, ৩৯, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৭৪

সূরা ৯ — তওবা (অনুশোচনা), আয়ত - ২, ৩, ৫, ৭, ১৪, ২০, ২১, ২৩, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৭৩, ১১১, ১২৩

সূরা ১৫ — হিজর (সামুদ জাতির বাসস্থান), আয়ত - ২

সূরা ৬ — নাহল (মৌমাছি), আয়ত - ২০, ২১

সূরা ৬৯ — হাক্কাহ্ (অনিবার্য সংঘটিতব্য), আয়ত - ৩০-৩৭

সূরা ৭২ — জ্বিন (জ্বিন), আয়ত ১৪-১৫

সূরা ৯৮ — বাইয়েনাহ্ (উজ্জ্বল অকাট্য দলিল), আয়ত - ৫১

(আয়তগুলির অনুবাদ - মওলানা মওদুদি সাহেবের কোরাণ-এ মজিদ থেকে উদ্ধৃত)

কোরাণ মজিদ-এর সূরা বাকরার ২৯নং আয়তে বলা হয়েছে – "একমাত্র তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তৈরী করেছেন ....."

ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই তিনি সমস্ত জিনিস তৈরী করেছেন, মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীতে সৃষ্ট কোন বস্তুতে কোন

অমুসলমানের অধিকার নাই। অমুসলমানরা যেখানে যা দখল করে আছে তা প্রায় জবর দখল। মুসলমানরা ইচ্ছা করলে তাদের বেদখল করে নিজেরা দখল নিতে পারে।

এইটা যে কতটা মুসলমান গর্ব বৃদ্ধি করেছে এবং আক্রমণকারী করে তুলেছে - ভারতের ইতিহাস তার সাক্ষী। অন্যান্য দেশও আছে।

১১নং সূরা - সূরা হুদ-এর ৩নং আয়তে যুগপৎ লোভ এবং ভয় দেখিয়ে আল্লাহ্‌র শরণে আসতে বলা হল। "তোমরা তোমাদের খোদার নিকট ক্ষমা চাও ও তাহারই দিকে ফিরিয়া এস। তাহা হইলে তিনি একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম জীবন সামগ্রী দান করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরাইয়া থাক তাহা হইলে আমি তোমাদের জন্য এক বড় ভীষণ দিনের আযাব সম্পর্কে ভয় করিতেছি।"

সূরা ২১ — আম্বিয়া (পয়গম্বরগণ), আয়ত - ৬৬, ৬৭, ৯৮-১০০

সূরা ২২ — হজ্জ, আয়ত - ১৯-২২, ৫৬-৫৭

সূরা ২৪ — নূর (জ্যোতি), আয়ত - ৩

সূরা ২৫ — ফোরকান (পার্থক্যকারী মানদন্ড), আয়ত - ১৭-১৯, ২৭, ৫২, ৫৫

সূরা ২৬ — আশ্‌-সু-আরা (কবিগণ), আয়ত - ৯৭-৯৯

সূরা ২৯ — আন্‌কাবুত (মাকড়শা), আয়ত - ৬, ৪১, ৬৯

সূরা ৩১ — লোকমান (লোকমান), আয়ত - ১৩

সূরা ৩৭ — সাফ্‌ফাত (সারিবদ্ধগণ), আয়ত - ২২-২৫, ২৬-৩২

সূরা ৩৮ — সাদ (সাদ), আয়ত - ৫৫-৫৭

সূরা ৪১ — হামীম আসসাজদা (হামীম সাজদা), আয়ত - ৩৩

সূরা ৪৭ — মুহাম্মদ (মুহাম্মদ), আয়ত - ৪-১৫

সূরা ৪৮ — ফাত্‌হ্‌ (বিজয়), আয়ত - ২৯

সূরা ৪৯ — হুজুরাত (কুটির সকল), আয়ত - ১৫

সূরা ৫৮ — মুজাদালা (বিতর্ক), আয়ত - ২৩

সূরা ৬০ — মুমতাহিনা (পরীক্ষাকারী), আয়ত ৪

সূরা ৬১ — সাফ্‌ (সারি), আয়ত ৯-১৩

সূরা ৬৬ — তাহরিম্‌ (নিষিদ্ধকরণ), আয়ত - ৯

সূরা ৬৮ — কালাম (কলম), আয়ত - ১০-১৩

সূরা ২ - সূরা বাকরা

আয়ত ঃ ১৫৪ - আর যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের মৃত বলিও না, এই সব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত ; কিন্তু তাহাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা হয় না।

('আল্লার পথে নিহত' বলতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ বুঝতে হবে- লেখক)

আয়ত ঃ ১৯১ -তাহাদের সহিত লড়াই কর, যেখানেই তাহাদের সহিত তাহাদের মোকাবিলা হয় ; এবং তাহাদের সেই সব স্থান হইতে বহিষ্কার কর, যেখান হইতে তাহারা তোমাদের বহিষ্কৃত করিয়াছে। এই জন্য যে নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ, **কিন্তু ফেতনা-ফেসাদ তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়।** আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সহিত লড়াই করিবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করিও না। কিন্তু তাহারা যদি সেখানেও লড়াই করিতে কুণ্ঠিন না হয়, তাহলে তোমরাও অসংকোচে তাহাদিগকে হত্যা কর। কেননা, এই ধরণের কাফেরদের এই রকমই শাস্তি।

আয়ত ঃ ১৯৩ - তোমরা তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাক যতক্ষণ না **ফেত্‌না চূড়ান্তভাবে শেষ হইয়া যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র খোদার জন্যই নির্দিষ্ট হয়।** তাহার পর যদি তাহারা বিরত হয় তবে বুঝিয়া লও যে, কেবলমাত্র যালেমদের ছাড়া আর কাহারও উপর হস্ত প্রসারিত করা সঙ্গত নহে।

আয়ত ঃ ২১৬ - **তোমাদিগকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,** আর তাহা তোমাদের অসহ্য মনে হইতেছে - হইতে পারে কোন কথা তোমাদের অসহ্য মনে হইল, অথচ তাহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইহাও হইতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভাল লাগিল, অথচ তাহাই তোমাদের পক্ষে খারাপ। প্রকৃত ব্যাপারতো আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

আয়ত ঃ ২২১ - তোমরা মুশরিক নারীদিগকে কখৰও বিবাহ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা ঈমান না আনিবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী, মুশারিক শরিফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত নারীকে তোমরা অধিক পছন্দ করিয়া থাক। অনুরূপ ভাবে নিজেদের কন্যাদিগকে মুশারিক পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয়

মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এই ব্যক্তিকেই তাহারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে ডাকিয়া নেয়। আর আল্লাহ্ তাহার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদিগকে বেহেশ্‌ত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান। তিনি তাহার বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকেদের নিকট ব্যক্ত করেন। আশা করা যায়, তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং উপদেশ কবুল করিবে।

(ঈমান আনা অর্থে মুসলমান হওয়া এবং ঈমানদার অর্থে মুসলমান - লেখক)

সূরা - ৩ - আলে ইমরান

আয়ত ঃ ২৮ - মুমিনগণ যেন কখনও ঈমানদার লোকেদের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এইরূপ করিবে খোদার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য তাহাদের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য ব্যবহৃত এইরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করিলে তাহা আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহার নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছেন, তোমাদিগকে তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

আয়ত ঃ ৮৫ - এই আনুগত্য - ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে চাহে তাহার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হইবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।

(এ ছাড়া আয়ত ১১৮ এবং ১১৯ আয়তে অমুসলমানদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। অমুসলমানরা নাকি সর্বদাই মুসলমানদের ক্ষতি চায়, মুখে হয়ত মিষ্টি কথা বলে ইত্যাদি নানা কারণেই কোন অমুসলমানদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে মুসলমানদের - লেখক)

আয়ত ঃ ১৪২ - তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা এমনই বেহশতে চলিয়া যাইবে? অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত ইহা দেখেন নাই যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে খোদার পথে প্রাণপনে লড়াই করিতে প্রস্তুত এবং তাহারই জন্য ধৈর্যশীল।

(খোদার পথে লড়াইর অর্থ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ - হয় তাদের হত্যা করা অথবা মুসলমান করা - লেখক।)

আয়ত ঃ ১৫৭ - তোমরা যদি খোদার পথে নিহত হও তবে খোদার যে রহমত ও দান তোমাদের নসীবে হইবে, যাহা এই সব লোক যাহা কিছুই সঞ্চয় সংগ্রহ করে, তাহা হইতে অনেক উত্তম।

(খোদার পথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকলে গণিমতের মাল পাওয়া যাবে। মারা গেলে বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, শহীদ আখ্যা নিয়ে সরাসরি বেহস্তে যেতে পারবে এবং সেখানে পৃথিবীতে প্রাপ্তব্য ভোগ বিলাস ও সুখের থেকে বহুগূণ বেশী ভোগ বিলাস লভ্য - লেখক।)

আয়ত ঃ ১৫৮ - আর তোমরা মৃত্যু মুখে পতিত হও বা নিহত হও, সকল অবস্থায়ই তোমাদের সকলকে একত্রিত হইয়া খোদার নিকটই উপস্থিত হইতে হইবে।

আয়ত ঃ ১৬৯ - যাহারা খোদার পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা জীবীত ; তাহারা খোদার নিকট হইতে রেযেক পাইতেছে।

১৭০ - আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহা পাইয়া তাহারা খুশী ও পরিতৃপ্ত।

১৭১ - তাহারা খোদার নিয়ামত ও অনুগ্রহ পাইয়া আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তাহারা জানে যে, আল্লাহ্ ঈমানদার লোকেদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

সূরা - ৪ ঃ সূরা আন-নিসা

আয়ত ঃ ১৪ - পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্ ও তাহার রসুলের নাফরমানী করিবে, সীমা সমূহকে লঙ্ঘন করিবে তাহাকে আল্লা আগুনে নিক্ষেপ করিবেন। সেখানে সে সবসময় থাকিবে, আর ইহা তাহার জন্য অপমানকর শাস্তি হইবে।

(অমুসলমানদের সর্বদাই নরকের আগুনে থাকবে। মুসলমান হলেই বাঁচোয়া।)

আয়ত ঃ ৮৪ - অতএব হে নবী, তুমি খোদার পথে লড়াই কর, তুমি তোমার নিজ ছাড়া অন্য কাহার জন্য দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদিগকে লড়াই করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে থাক। সম্ভবতঃ আল্লা অতি শীঘ্র কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করিয়া দিবেন। কেননা, খোদার শক্তিই সর্বাপেক্ষা জবরদস্ত এবং তাহার দেওয়া শাস্তি সব থেকে কঠোর।

আয়ত ঃ ৯৫ - যে সব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসিয়া থাকে, আর যাহারা খোদার পথে জান ও মান দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরণের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ্ বসিয়া থাকা লোকেদের অপেক্ষা জান-মান দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রাখিয়াছেন। তাঁহার

দরবারে মুজাহিদদের কল্যানকর কাজের ফল বসিয়া থাকা লোকেদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

(মুজাহিদ অর্থে যারা অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে - একেই বলে আল্লাহ্ পথে বা খোদার পথে যুদ্ধ - সংক্ষেপে জেহাদ - লেখক।)

আয়ত ঃ ৯৬ - তাহাদের জন্য খোদার নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে। খোদা বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

আয়ত ঃ ১০০ - বস্তুতঃ আল্লাহ্র পথে যেই হিজরৎ করিবে, যমীনে আশ্রয় লইবার জন্য সে অনেক জায়গা এবং দিন যাপনের জন্য বিরাট অবকাশ পাইবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে আল্লাহ্ ও রসুলের দিকে হিযরৎ করার জন্য বাহির হইবে এবং পথিমধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে তাহার প্রতিফল দান করা খোদার পক্ষে ওয়াজেব্ হইবে। আল্লাহ্ বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল।

(যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছে (অর্থাৎ মুসলমান হয়েছে) তার পক্ষে কাফেরী সমাজ ব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করা মাত্র দুই ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। প্রথম সে সেই ভূখণ্ডে ঈসলামকে বিজয়ী করার এবং কাফেরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে থাকবে। দ্বিতীয় সে সেস্থান থেকে প্রস্থান করার কোন উপায় পাচ্ছে না এবং তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সঙ্গে নিরূপায় হয়ে সেখানে বসবাস করছে - মাওদুদী সাহেব)

(এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মুসলমানদের ব্যবহার, কাশ্মীর সহ অন্যান্য রাজ্যে - কী রকম তা ব্যাখ্যা করে নিতে হবে - লেখক।)

সূরা - আল মায়েদা

আয়ত ঃ ১৭ - নিশ্চয়ই তাহারা কুফ্রি করিয়াছে যাহারা বলিয়াছে মরিময়পুত্র মসীহ খোদা, হে মুহম্মদ, তাহাদিগকে বল যে আল্লাহ্ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহকে এবং তাহার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করিতে চাহেন তবে তাঁহার ইচ্ছা হইতে তাহাকে বিরত করিবার শক্তি কাহার আছে ?

(কুফরি করা অর্থে অমুসলমানি কাজ। মরিয়ম পুত্র অর্থে যীশু। এই আয়তে যীশুর কর্তৃত্ব, যা খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে, তা অস্বীকার করা হল। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে যীশু, যীশুর মা এবং সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে পারেন। তাকে কেউ আটকাতে পারবে না - লেখক)

আয়ত ঃ ১৮ - ইয়াহুদ ও নাসারগণ বলে যে, আমরা খোদার সন্তান ও তাহার প্রিয় পাত্র। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে খোদা তোমাদের গুনাহ্-খাতার কারণে শাস্তি দিলেন কেন ? প্রকৃত ব্যাপার এই যে তোমরাও খোদার অন্যান্য সৃষ্ট মানুষের মতই সমান মর্যাদার মানুষ। যাহাকে ইচ্ছা মাফ্ করেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আকাশ-পৃথিবী এবং তাহার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁহারই মালিকানা।

(ইয়াহুদী অর্থে ইহুদী। মদিনার ইহুদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে নবী মহম্মদের নেতৃত্বে মুসলমানরা যে ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তা লোমহর্ষক। বনি কুয়ানুকা, বনি নাজীর এবং বনি কুরাইজা - এই তিন ইহুদীগোষ্ঠী। বুখারীর হাদিস - ষষ্ঠ খন্ড - কিতাবুল মহারেবীন - লেখক।)

আয়ত ঃ ৩৭ - তাহারা দোযখের অগ্নিগহ্বর হইতে বাহির হইয়া যাইতে চাহিবে, কিন্তু পারিবে না। তাহাদের জন্য স্থায়ী আমান নির্দিষ্ট করা হইবে। (যারা মুসলমান নয় তাদের জন্য ব্যবস্থা)

আয়ত ঃ ১১৬-১১৭ - মরিয়মপুত্র ঈশা স্বীকার করলেন যে, তিনি নিজে এবং অন্য সকলে খোদারই বান্দা। ঈশা সেই সময় পর্যন্ত মানুষদের পাহারাদার ছিলেন, তারপর খোদা তাকে ডেকে পাঠালেন, তারপর খোদাই সব কিছুর সংরক্ষক ও সব মানুষেরও সংরক্ষক হয়ে গেলেন।

(সংক্ষেপিত - লেখক)

সূরা ঃ আল আম

আয়ত ঃ ২১-২৩ - যেদিন আমি এই সবকেই একত্রিত করিব এবং মুশরিকগণকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাদের নির্দিষ্ট করা সেই শরীকগণ এখন কোথায় যাহাদিগকে তোমাদের খোদা বলিয়া মনে করিতে ? (মুশরিক অর্থে অমুসলমান যারা পৌত্তলিক এবং বিভিন্ন মূর্তিতে ঈশ্বর কল্পনা করে উপাসনা করে - লেখক)

তখন তাহারা বলিবে - হে আমাদের মালিক, তোমার কসম করিয়া বলি, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না - (অর্থাৎ তারা ভয়ে মিথ্যাচার করবে। - লেখক)

আয়ত ঃ ৪০-৪১ - তাহাদিগকে বল, তোমাদের উপর যদি খোদার নিকট হইতে কোন বড় বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও ডাক ? বল না, যদি সত্যবাদী হও।

তখন তো তোমরা সকলেই আল্লাকে ডাকিয়া থাক। অতঃপর তিনি

যদি চাহেন তোমাদের উপর হইতে এই বিপদ দূর করেন। এই ধরণের অবস্থায় তোমরা তোমাদের বানাইয়া লওয়া শরীক 'মা' বুদদিগকে সম্পূর্ণ ভূলিয়া যাও।

(তোমাদের দেবদেবীর কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র শরণে এসো - লেখক)

আয়ত ঃ ১৪৮ - (মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে - লেখক)

সূরা ৭ - আ-রাফ্

আয়ত ঃ ১৭৩ - কিংবা যেন বলিতে না শুরু কর যে, শের্‌ক তো আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের পূর্বে শুরু করিয়াছিল, আমরাতো পরে তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখন কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থীদের করা অপরাধের দরুন আমাদের পাকড়াও করিবেন ?

(মূর্তিপূজা করে আল্লাহ্‌র শরীক তৈরী করে অমুসলমানদের পিতা-পিতৃপুরুষ মহা অপরাধ করেছিল। তাদের সেই অপরাধের সাজা বর্তমান প্রজন্মকে আল্লাহ্ দেবেন কি ? - লেখক)

সূরা ৮ - আনফাল

আয়ত ঃ ১২ - আর সেই সময়ের কথাও, যখন তোমাদের খোদা ফের্‌সতাদের প্রতি ঈশারা করিয়া বলিতেছেন ; আমি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছি, তোমরা ঈমানদার দের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাখ, আমি এখনই এই কাফেরদের দিলে ভীতির উদ্রেক করিয়া দিতেছি। অতএব তোমরা তাহাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও।

আয়ত ঃ ১৩ - ইহা এই জন্য কর যে উহারা আল্লাহ্ এবং তাহার রসুলের সহিত মোকাবেলা করিল। আর যাহারাই আল্লাহ্ এবং তাহার রসুদের সহিত মুকাবিলা করিবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বড়ই কঠোর।

আয়ত ঃ ১৫-১৯ - হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন এক সৈন্য বাহিনীরূপে কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তাহাদের মুকাবিলা করা হইতে কখনই পশ্চাৎমুখী হইবে না। এইরূপ অবস্থায় যে লোক পশ্চাৎমুখী হয়, কৌশল হিসাবে হইলে অন্য কথা, সে নিশ্চয় খোদার গজব-এ পড়িবে। জাহান্নামই হইবে তাহার ঠিকানা, আর তাহা প্রত্যাবর্তনের পক্ষে বড়ই খারাপ জায়গা।

অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাহাদের হত্যা কর নাই, আল্লাই তাহাদের হত্যা করিয়াছেন। আর তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাই নিক্ষেপ করিয়াছেন।

ইহাতো তোমাদের সাথের ব্যাপার। কাফেরদের সহিত আচরণ এইরূপ যে, আল্লাহ্ অপকৌশল সমূহ বলহীন করিবেন।

এই কাফেরের দল, তোমরা যদি ফায়সালা চাও, তবে গ্রহণ কর, ফায়সালা তোমাদের সামনে আসিয়াছে। এখন বিরত হও। ইহা তোমাদের পক্ষেই কল্যানকর। অন্যথায় সেই নিবুর্দ্ধিতাই পুনর্বার করিলে আমরাও সেই শাস্তির পুনরাবৃত্তি করিব। তোমাদের বাহিনী কিছুই করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ ঈমানদার বাহিনীর সঙ্গে আছেন।

আয়াত : ১৯ - হে ঈমানদার লোকেরা, এই কাফেরদের সঙ্গে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেত্না খতম হইয়া যায় এবং দ্বীন পুনরাপুরিভাবে আল্লাহ্র জন্য হইয়া যায়। পরে তাহারা যদি ফেতনা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহাদের আমল খোদাই দেখিবেন।

আয়াত : ৩৮ - হে নবী, এই কাফেরদের বল, এখনও যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহা হইলে পূর্বে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা মাফ্ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহারা যদি সেই পূর্বের রীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে, তবে অতীত জাতি সমূহের যে পরিণতি হইয়াছে, তাহা সকলেরই জানা আছে।

আয়াত : ৫৫ - নিশ্চয়ই আল্লাতালার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হইতেছে সেই সব লোক যারা মহাসত্যকে (ইসলামকে - লেখক) মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে ; পরে তাহারা কোন প্রকারেই তাহা কবুল করিতে প্রস্তুত হয় নাই।

আয়াত : ৫৯ - সত্য অমান্যকারী লোকেরা যেন এই ভুল ধারণায় না থাকে যে, তাহারা ময়দান দখল করিয়া লইয়াছে। তাহারা নিশ্চয় আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

আয়াত : ৬০ - আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশী শক্তিশালী ও সদা সজ্জিত বাঁধাঘোড়া তাহাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখ। যেন উহার সাহায্যে আল্লাহ্ এবং নিজের শত্রুদের ভীত শঙ্কিত করিতে পার যাহাদিগকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন। আল্লার পথে তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পুরাপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তোমাদের সহিত কখনও জুলুম করা হইবে না।

আয়াত : ৬৫ - হে নবী, মুমিন লোকেদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে

কুড়িজন লোক যদি ধৈর্য্যশালী হয় তবে তাহারা দুইশতের উপর জয়ী হইবে। আর যদি একশত লোক এইরূপ থাকে তাহা হইলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে। কেননা উহারা এমন লোক, যাহারা জ্ঞান রাখে না।

(মুমিন - ঈমানদার মুসলমান। সত্য অমান্যকারী - অমুসলমান - লেখক)

আয়ত ঃ ৭২ - যে সব লোক ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে, খোদার পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, ও মাল খরচ করিয়াছে, আর যাহারা হিজরত কারীদের আশ্রয় দিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্য করিয়াছে তাহারাই পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যাহার ঈমান তো আনিয়াছে কিন্তু হিজরৎ করিয়া (দারুল ইসলাম) আগমন করে নাই, তাহাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নাই - যতক্ষণ না তাহারা হিজরৎ করিয়া আসিবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে যদি তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাহাও এমন কোন জাতির বিরুদ্ধে হইতে পারিবে না যাহাদের সহিত তোমাদের চুক্তি রহিয়াছে। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখিতে থাকেন।

(হিজরৎ - অমুসলমান দেশ (দারুল হারম্) থেকে ঐস্লামিক দেশে (দারুল ইসলামে) আশ্রয় নেওয়া। খোদার পথে ইত্যাদি - অমুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করেছে। — লেখক)

আয়ত ঃ ৭৪ - যাহার ঈমান আনিয়াছে, আর যাহারা আল্লার পথে নিজেদের ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়াছে এবং চেষ্টা সাধনা করিয়াছে, আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে তাহারাই খাঁটি এবং প্রকৃত মুমিন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট রেজেক।

(ঈমান আনিয়াছে - মুসলমান হয়েছে)

সূরা ৯ - আত্তওবা

আয়ত ঃ ৫ - অতএব হারাম মাস অতীত হইলে, তখন মুশরিক্দের হত্যা কর যেখানেই তাহাদের পাও ; এবং তাহাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাহাদের খবরা খবর লইবার জন্য শক্ত হইয়া বস। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

(হারাম মাস - অমুসলমানদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য চার মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। মুশরিক - অমুসলমান। তওবা করা - অনুতাপ অনুশোচনা। নামায কায়েম - মুসলমান হয়ে নামাজ পড়ে।)

আয়ত ঃ ১৪ - তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন। তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন। বহু সংখ্যক মুমিনের দিলকে ঠাণ্ডা ও শীতল করিবেন।

আয়ত ঃ ২০ - খোদার নিকট তো সেই লোকেদেরই অতি বড় মর্যাদা, যাহারা তাঁহার পথে নিজেদের ঘর বাড়ী ছাড়িয়াছে এবং প্রাণপণ সাধনা করিয়াছে ; তাহারাই সফল কাম

(তাঁহার পথে - খোদার পথে, যারা জিহাদ করেছে এবং তার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়েছে - জিহাদ সৈন্য)

আয়ত ঃ ২১ - তাহাদের খোদা তাহাদিগকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং জান্নাৎ-এর সুসংবাদ দিতেছেন, যেখানে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। (জান্নাৎ - স্বর্গ - লেখক)

আয়ত ঃ ২৩ - হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিওনা যদি তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফর্ অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরণের লোকেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে-ই যালেম হইবে।

(মুসলমান না হলে বাবা, বাবা নয়, ভাই ভাই নয়। নবী মহম্মদের একজন কাকা আবু তালেব, মহম্মদের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তার অভিভাবকত্ব করেন। বিশেষ করে নবীর ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পর কাকা আবু তালেবই ছিলেন মহম্মদের জীবনের সব কিছু। কিন্তু আবু তালেব পিতৃ-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করেন নি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি কুফ্র ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করেন নি। নবী তাঁর সমস্ত পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং বলতেন যে তাঁরা নরকেই থাকবেন। ইসলামী নিয়মে অমুসলমান কারুই স্বর্গে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাদের জন্য কেবলমাত্র নরকের আগুনই বরাদ্দ। আবু তালেব কাফের অথচ নবীকে দাঁড় করিয়েছেন তিনিই। আবু তালেবের মৃত্যু হয় ৬২০ খৃষ্টাব্দে। আবু তালেব কাফের হওয়া সত্ত্বেও নবী তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু নরকের আগুন? আবু তালেবের মত এত শ্রদ্ধেয় এবং মান্য ব্যক্তিকেও নরকে যেতে

হবে কাফের হওয়ায় ? হ্যাঁ তাই-ই বরাদ্দ। তবে নবী বললেন, তিনি সব থেকে কম আগুনের নরকে যাবেন এবং আগুনের পোষাকের বদলে, তাঁকে শুধু আগুনের জুতো পরানো হবে। (মুসলিম-৪১৩)। তবে শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন তাঁর কোরআন শরীফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে আবু তালেব মৃত্যুকালে কলেমা উচ্চারণ করেছিলেন।)

আয়ত ঃ ২৮ - হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বৎসরের পরে তাহারা যেন মসজিদের হারামের নিকটেও না আসিতে পারে। তোমদের যদি অভাব অনটনের ভয় হয়, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ্ চাহিলে তিনি তোমাদিগকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করিয়া দিবেন। আল্লা বস্তুতই সর্বজ্ঞ ও অতুলনীয় জ্ঞানী।

(মুশরিক - অমুসলমান, নাপাক - অপবিত্র। এই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর মক্কার কাবা অমুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল)

আয়ত ঃ ২৯ - যুদ্ধ কর, আহলি-কিতাবের সেই লোকেদের বিরুদ্ধে, যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হারাম করে না। এবং সত্যদ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না। তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাক, যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হইয়া থাকিতে প্রস্তুত হয়।

(জিজিয়া তাদের ইসলাম আনুগত্যে নিদর্শন। তারা যেন যমীনের উপর শাসক এবং আদেশ দাতার মর্যাদায় না থাকে।)

আয়ত ঃ ৩৩ - প্রকৃতকথা এই যে, যখন হইতে আল্লাহ্ যমীন - আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন হইতেই মাসগুলির সংখ্যা মাত্র ১২। উহার মধ্যে ৪টি মাস হারাম। এই ৪ মাসে নিজেদের উপর যুলুম করিওনা। মুশরিকদের সাথে সকলে মিলিয়া লড়াই কর। আর জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকি লোকেদের সঙ্গেই আছেন।

(নবী মহম্মদের অনেক আগেকার কাল থেকেই জিলক্বদ, জিলহজ ও মহরম এই তিন মাস হজের জন্য এবং রজব মাস 'উমরা'র জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই চারমাস হারাম মাস।)

আয়ত ঃ ৩৯ - তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না কর, তাহা হইলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। তোমরা খোদার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার।

(জেহাদ বাধ্যতামূলক হল। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেই অমুসলমানদের মুসলমান করার জন্য জেহাদে অংশ নিতেই হবে। অন্যথায়, খোদা অন্য কাউকে ক্ষমতায় আনবেন। - লেখক)

আয়ত ঃ ৪১ - তোমরা বাহির হইয়া পড় - হালকাভাবে কিংবা ভারাক্রান্ত হইয়া। আর জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সঙ্গে লইয়া, ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলময় - যদি তোমরা জান।

আয়ত ঃ ৭৩ - হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে। পূর্ণ শক্তিতে জেহাদ কর এবং তাহাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরিণতি হইতেছে জাহান্নাম্, আর তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

(কাফের - অমুসলমান, মুনাফেক - কপট মুসলমান, জাহান্নাম - নরক। লেখক)

আয়ত ঃ ১১১ - প্রকৃতকথা এই যে, আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের হৃদয়-মন এবং তাহাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা আল্লার পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাহাদের প্রতি জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি একটি পাকা পোক্ত প্রতিশ্রুতি। খোদার অপেক্ষা নিজের ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূরণকারী আর কে আছে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের দরুণ, যাহা তোমরা খোদার সহিত সম্পন্ন করিয়াছ - ইহাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

(খোদা ও তার বান্দার মধ্যে ঈমানের বিষয়টি একটি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপার রূপে অভিহিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ ঈমান প্রকৃতপক্ষে একটি অঙ্গীকার ও চুক্তি যার দ্বারা বান্দা তার স্বকীয় সত্তা ও নিজের অর্থ সম্পদ খোদার হাতে বিক্রয় করে দেয়। বিনিময়ে খোদার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পায় যে মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যাবে। বিচার্য যে সন্ত্রাসবাদীরা বিশেষ করে যারা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাসভ বা আফজল গুরুর মত কাজ করে - এই আয়ত তাদের কতটা উৎসাহিত করে।)

আয়ত ঃ ১২৩ - হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকেদের বিরুদ্ধে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী রহিয়াছে। তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখিতে পায়। আর জানিয়া লও আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকেদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।

সূরা ১৫ - আলহিজর

আয়ত ঃ ২ - ইহা দূরের ব্যাপার নয় যে এমন একটা সময় আসিবে, যখন তাহারাই - যাহারা আজ ইসলামের দাওয়াত কবুল করিতে অস্বীকার করিতেছে, অনুতাপ ও আফশোষ করিয়া বলিবে, হায়, আমরা যদি অনুগত হইয়া মানিয়া লইতাম।

সূরা ১৬ - আন্-নাহল

আয়ত ঃ ৭৪ - অতএব আল্লার তুলনা বানাইও না। আল্লাই জানেন, তোমরা জান না।

আয়ত ঃ ২০-২১ - আর সেই অন্যান্য সত্তাগুলি, মানুষ খোদাকে ত্যাগ করিয়া যাহাদেরকে ডাকে, যে সব কোন কিছুই সৃষ্টি কর্তা নয়। উহারা সব মৃত, জীবিত নয়। আর সে সবের কিছুই জানা নাই, তাহাদেরকে কবে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উঠান হইবে।

সূরা ২১ - সূরা আল আম্বিয়া

আয়ত ঃ ৬৬-৬৭ - ইব্রাহিম বলিল, তাহা হইলে তোমরা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়া সেই সব জিনিসের পূজা কর, যাহারা তোমাদের না কোন উপকার করিতে পারে, না কোন ক্ষতি। আফ্শোস তোমাদের জন্য আর তোমাদের এই মাবুদগুলির জন্য আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমরা যেগুলির পূজা করিতেছ। তোমাদের কি কোন জ্ঞান বুদ্ধি নাই?

আয়ত ঃ ৯৮-১০০ - নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সেই সব মাবুদ - যাহাদের তোমরা পূজা কর - জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমাদেরও সেইখানে যাইতে হইবে।

আয়ত ঃ ৯১ - ইহারা যদি প্রকৃত খোদা হইত তবে তাহারা নিশ্চয়ই সেখানে যাইত না। অতঃপর সকলকেই চিরদিন সেইখানে থাকিতে হইবে।

আয়ত ঃ ১০০ - সেখানে তাহারা কানফাটা আর্তনাদ করিতে থাকিবে। আর অবস্থা এই হইবে যে, সেখানে তাহারা কোন আওয়াজই শুনিতে পাইবে না।

সূরা ৩৩ - সূরা আল হজ্জ

আয়ত ঃ ১৯ - এই দুইটি পক্ষ, ইহাদের মধ্যে তাহাদের রব্ব সম্পর্কে ঝগড়া

হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোষাক কাটিয়া তৈরী করা হইয়াছে। তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পলি ঢালা হইবে।

আয়ত ঃ ২০ - যাহার ফলে তাহাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যেকার সব কিছু গলিয়া যাইবে।

আয়ত ঃ ৫৬-৫৭ - এই দিন বাদশাহী হইবে আল্লার এবং তিনি তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দিবেন। যাহারা ঈমানদার ও নেক আমলকারী হইবে, তাহারা নে'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে যাইবে। আর যাহারা কাফের হইবে এবং আমাদের আয়ত সমূহকে মিথ্যা মনে করিয়া অমান্যকারী হইবে তাহাদের জন্য অপমানকর আযাব হইবে।

সূরা ২৪ - সূরা আন-নূর

আয়ত ঃ ৩ - ব্যাভিচারী যেন বিবাহ না করে। ব্যাভিচারিনী বা মোশরেক স্ত্রী লোক ছাড়া (আর কাহাকেও)। আর ব্যাভিচারিনীকে বিবাহ করিবে না ব্যাভিচারী বা মোশরেক ছাড়া। ইহা ঈমানদার লোকদের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূরা ২৫ - আলফোকরান

(এই সূরায় নবীর পেশকৃত আদর্শ সম্পর্কে মক্কার কাফেররা (অমুসলমানরা) যে সব সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল - সে বিষয়ে সওয়াল জবাব আছে)

আয়ত ঃ ২৬ - সেদিন প্রকৃত বাদশাহী কেবল রহমানেরই হইবে, আর তাহা অমান্যকারীদের বড় কঠিন দিন হইবে।

আয়ত ঃ ২৭ - যালেম লোকেরা নিজেদের হাত কামড়াইবে ও বলিবে, হায়, আমি যদি রসুলের সঙ্গ গ্রহণ করিতাম।

আয়ত ঃ ৫ - এই খোদাকে ছাড়িয়া লোকেরা এমন সব জিনিসের পূজা করে যাহা না তাহাদের কোন কল্যাণ করিতে পারে, না পারে অকল্যাণ করিতে। উপরন্তু কাফের লোক তাহাদের খোদার বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিদ্রোহীরাই সাহায্যকারী হইয়া রহিয়াছে।

আয়ত ঃ ৫২ - অতএব হে নবী, কাফের লোকেদের কথা কস্মিনকালেও মানিও না, আর এই কোরাণ লইয়া তাহাদের সহিত বড় জেহাদ কর।

সূরা ২৬ - আশ-শুআরা

আয়ত ঃ ৯৬-৯৯ - এই বিভ্রান্ত লোকেরা (অমুসলমান) নিজের মাবুদদিগকে বলিবে খোদার শপথ, আমরাতো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম। যখন তোমাদিগকে রব্বুল আলামীনের সমান মর্যাদা দিতে ছিলাম। আর সেই অপরাধী লোকেরাই আমাদিগকে এই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করিয়াছে।

সূরা ২৯ - সূরা আল আনকাবুত

আয়ত ঃ ৬ - যে কেহই সংগ্রাম সাধনা করিবে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করিবে। আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

(মুসলমানরা জিহাদ (সংগ্রাম সাধনা) করবে নিজের জন্য)

আয়ত ঃ ৪১ - যে সব লোক আল্লাকে ছাড়িয়া অন্য পৃষ্ঠপোষক বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়শার মত। উহা নিজের একটি ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হইতেছে মাকড়শার ঘর। হায় এই লোকেরা যদি তাহা জানিত।

আয়ত ঃ ৪৯ - আসলে এইগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন বিশেষ সেই লোকেদের অন্তরে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। আর আমাদের আয়ত সমূহ যালেম লোক ব্যতীত আর কেহ অস্বীকার করে না।

সূরা ৩১ - সূরা লোকমান

আয়ত ঃ ১৩ - স্মরণ কর, লোকমান যখন নিজের পুত্রকে উপদেশ দিতেছিল, তখন সে বলিল, পুত্র খোদার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। প্রকৃত কথা এই যে শের্‌ক অতি বড় যুলুমের কাজ।

(লোকমান ঃ অতীত যুগের এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি। শের্‌ক ঃ অংশীবাদীতা - ঈশ্বরের বহুরূপ কল্পনা)

সূরা ৩২ - সূরা আস্-সাজদা

আয়ত ঃ ২২ - যাহারা খোদার আদেশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় (অমান্য করে), এই সব পাপীদের উপর তা আমরা প্রতিশোধ লইয়াই ছাড়িব।

সূরা ৩৭ - সূরা আস্ সাফ্‌ফাত

আয়ত ঃ ২২-২৩ - হুকুম হইবে, সব যালেম, তাহাদের সব সঙ্গীসাথী এবং

খোদাকে বাদ দিয়া তাহারা যে সব মাবুদের বন্দেগী করিত তাহাদের সকলকেই ঘেরাও করিয়া লইয়া এস। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের পথ দেখাও।

আয়ত ঃ ৩৮ - এখন ইহাদিগকে বলা হইবে যে, আমরা অবশ্যই পীড়াদায়ক আযাব আস্বাদন করিবে।

সূরা ৩৮ - সূরা সাদ

আয়ত ঃ ৫৫-৫৮ - ইহা হইল মুত্তাকী লোকেদের পরিণাম। আর দেশদ্রোহী লোকেদের জন্য নিকৃষ্ট ধরণের পরিণতি রহিয়াছে। জাহান্নাম - ইহাতে তাহারা জ্বলিবে, ইহা অতি খারাপ স্থান। ইহা তাহাদের জন্য। অতএব তাহারা স্বাদ গ্রহণ করিবে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফোটা পানি, পুঁজ-রক্ত এবং এই ধরণের আরও অনেক কষ্টের।

সূরা ৪১ - সূরা হা মীম আস্‌-সাজদা

আয়ত ঃ ৩৩ - আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কাহার হইবে যে আল্লার দিকে ডাকিল, নেক আমল করিল এবং বলিল আমি মুসলমান।

সূরা ৪৭ - সূরা মহম্মদ

আয়ত ঃ ৪-৫ - অতএব এই কাফেরদের সহিত যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ সংঘটিত হইবে তখন প্রথম কাজই হইল গলা সমূহ কর্তন করা। এমন কি তোমরা যখন তাহাদিগকে খুব ভাল ভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে, তখন বন্দী লোকদিগকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে, কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করিয়া লইবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ অস্ত্র সংবরণ করে। ইহাই হইল তোমাদের করার মত কাজ। আল্লাহ্‌ চাহিলে নিজেই সব কিছু বোঝাপড়া করিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি এই কর্মপন্থা এই জন্যই অবলম্বন করিয়াছেন যেন তোমাদিগকে একজনের দ্বারা অন্যজনের পরীক্ষা ও যাচাই করিতে পারেন। আর যে সব লোক আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইবে, আল্লাহ্‌ তাহাদের আমল সমূহকে কখনই নষ্ট ও ধ্বংস করিবেন না। তিনি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন, তাহাদের অবস্থা সুসংহত করিয়া দিবেন।

আয়ত ঃ ৮ - যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত এবং আল্লা তাহাদের কার্যাবলী বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছেন। কেননা, তাহারা সেই জিনিস অপছন্দ করিয়াছে, আল্লা যাহা নাযিল করিয়াছেন।

আয়ত ঃ ১১ - ইহা এই কারণে যে, ঈমানদার লোকেদের সাহায্যকারী ও সমর্থক হইতেছেন আল্লাতায়লা। আর কাফেরদের সাহায্যকারী সমর্থনকারী কেহই নাই।

আয়ত ঃ ২৫ - মুত্তাকি লোকেদের জন্য যে জান্নাত্-এর ওয়াদা করা হইয়াছিল, উহার পরিচয় এই যে, উহাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান হইয়া থাকিবে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণা ধারা প্রবহমান থাকিবে এমন দুধের যাহা কখনও বিস্বাদ হইবে না। ঝর্ণাধারা সুস্বাদু ও সুপেয় হইবে। ঝর্ণা প্রবহমান থাকিবে - মধুর। সেখানে তাহাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকিবে। খোদার নিকট হইতে থাকিবে ক্ষমা। যাহারা চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে তাহাদের এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের অন্ত্র পর্যন্ত কাটিয়া দিবে।

সূরা ৪৯ - সূরা হুজুরাত

আয়ত ঃ ১৫ - প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও তাহার রসুলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, অতঃপর কোন সন্দেহ করে না এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে। তাহারাই সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ লোক।

সূরা ৬০ - সূরা আল মুমতাহিনা

আয়ত ঃ ৪ - আমি তোমাদের হইতে এবং খোদাকে ছাড়িয়া যে মাবুদের তোমরা পূজা উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ও বিমুখ। আমরা তোমাদের অস্বীকার করিয়াছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হইয়াছে। বিরোধ-ব্যবধান শুরু হইয়া গিয়াছে - যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবে।

সূরা ৬১ - সূরা আস-সাফ্

আয়ত ঃ ১১ - তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তার রসুলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। ইহাই তোমাদের পক্ষে অতীব উত্তম। যদি তোমরা জান।

সূরা ৬৬ - সূরা আত-তাহরিম

আয়ত ঃ ৯ - হে নবী ! কাফের ও মুনাফিক্‌দের বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাহাদের সহিত কঠোর নীতি প্রযোগ কর। তাহাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম এবং পরিণতি হিসাবে উহা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান।

পরিশিষ্ট - ২
টীকা

(কিছু কিছু আরবী, ফার্সী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলির সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পরিশিষ্ট ২ সেই উদ্দেশ্যে)

১। কোন কোন মহল প্রমাণ করতে আগ্রহী যে ইসলাম পরমত সহিষ্ণু। ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম পন্থী সেই সব বিদ্বজ্জনেরা কোর-আন-এর ১০৯ নং সূরা - সূরা আল-কাফেরুন-এর ১ থেকে ৬নং আয়তগুলি উল্লেখ করেন। এই সূরায় মাত্র ৬টি আয়ত আছে।

১-২. বলিয়া দাও ঃ হে কাফেররা আমি সেই সবের ইবাদত করিনা যাহাদের ইবাদত তোমরা কর।

৩. আর না তোমরা তাঁহার ইবাদত কর, যাহার ইবাদত আমি করি।

৪. আমি তাহাদের ইবাদত করিতে প্রস্তুত নহি যাহাদের ইবাদত তোমরা করিয়াছ।

৫. আর না তোমরা তাঁহার ইবাদত করিতে প্রস্তুত যাহার ইবাদত আমি করি। ।

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

(ইবাদত - উপাসনা, কাফের - যারা আল্লাহ্ ও রসুল এবং কোরাণে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে না।)

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, নবী মক্কায় থাকাকালীন (প্রায় ১২-১৩ বছর) যে আয়তগুলি নাযিল হয়েছিল, সেগুলি কিছু নরম সুরের ছিল। নবী মদিনায় থাকাকালীন (প্রায় ১০ বছর) যে আয়তগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলি চড়া সুরের। মদিনায় তিনি ক্রমাগত যত সাফল্য পেয়েছেন, তত তার সুর কঠোর হয়েছে।

এই সুরাটিই - সূরা আল কাফেরুন, মক্কায় অবতীর্ণ। অর্থাৎ তার মানে এই নয় যে, এটি নরম সুরের এবং অন্য ধর্মের প্রতি নমনীয়তার প্রকাশ।

এ প্রসঙ্গে বিদ্বজ্জনের ভুল ভাঙ্গাতে মওলানা সাইয়েদ আবুল-আলা-মাওদুদী সাহেব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা বিদ্বজ্জনের ভুল ভাঙ্গাতে পারে।

মক্কায় থাকাকালীন মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলামের সঙ্গে মক্কার মূর্তি পূজক কোরেইশদের বিরোধ তুমুল হয়। কুরেশরা নবীকে প্রস্তাব দিল (ক) মহম্মদকে তারা সর্বাপেক্ষা ধনীব্যক্তি বানিয়ে দেবে, তার পছন্দমত যে কোন নারীর সঙ্গে বিবাহ দেবে, কিন্তু মহম্মদকে কথা দিতে হবে যে, তিনি কোরেশদের উপাস্য দেবদেবীর বিরুদ্ধতা করতে এবং দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবেন। (খ) এক বছর কাল নবী মহম্মদ কুরেশদের উপাস্য লাত ও উজ্জার উপাসনা করবেন, আর এক বছর কাল কুরেশরা নবী মহম্মদের উপাস্যর উপাসনা করবে। নবী খোদার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলেন। তারপর সূরা আল-কাফেরুন অবতীর্ণ হল।

মাওদুদী সাহেব লিখেছেন, ধর্মীয় উদারতা বা সহ-অবস্থান নীতি ঘোষণার উদ্দেশ্যে এই সূরাটি নাযিল হয়নি। এতে এ ধরণের কোন ভাবধারা আদৌ বর্তমান নাই। বর্তমান কালের কিছু কিছু লোক যে এরূপ ভাবধারা প্রকাশ করতে চেষ্টা পেয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা, অশ্রদ্ধা ও অনমনীয়তার চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। কুফরী ধর্ম ও দ্বীন ইসলাম যে পুরোমাত্রায় পরস্পর বিরোধী, কোন দিক দিয়েই যে মিলিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, এ কথাটা তেজস্বী ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল। বর্তমান সূরাটি সেই আবশ্যকীয়তটি পূরণ করেছে।

(সূত্র ঃ কোরআন-এ মজিদ পৃ. ১১৫৮-১১৬০ আবুল আলা মওদুদী)

টীকা - ২ অংশীবাদ

আল্লা ব্যতীত অন্য কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করা বা অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করার নাম আল্লার অংশী সৃষ্টি করা। অংশীবাদ, ইসলামে গুরুতর পাপ। আল্লাই সর্ব বিষয়ে নির্ভরস্থল। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তবে আল্লা মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ না করলেও তিনি মানবরূপী রসুল প্রেরণ করেন। তাই রসুল বলতে বোঝায় আল্লার বার্তাবহনকারী। ইসলামের সর্বশেষ রসুল হলেন - নবী মহম্মদ। খাতামুননা বিঈয়িন। যার মধ্যে নব্যুয়ত ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। স্বয়ং আল্লাহ্ অংশীবাদীদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে নির্মম।

টীকা - ৩ ঃ আল্লাহ্

আরবী শব্দ। আল এবং ইলা্ এই দুই শব্দ মিলে আল্লাহ্ শব্দ নিষ্পন্ন। ইলাহ্ শব্দের অর্থ উপাস্য এবং আল শব্দের ইংরাজী The। বাংলায় দাঁড়ায় উপাস্যটি। বলা হয় আল্লা নিরাকার। মুসলিম এর হাদীশ অনুসারে তিনি নিজের আদলে প্রথম মানব হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছেন (মুসলিম - ২৮৭২ - ড. ব্রহ্মচারী পৃ. ১০০)। কেয়ামতের দিন আল্লা দৃশ্যমান হবেন। (আকার না থাকলে দৃশ্যমান হওয়া যায় না, নিজের আদলে কিছু বানানো যায় না।) বলা হয়েছে তার কোন স্ত্রী নাই। (সূরা আন্‌তাম - আয়ত ১০১) অনুমান করা যায় তিনি পুরুষ ছিলেন।

যাইহোক, তিনি শূন্য থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করেন। তিনি 'কুন' (হও) বললেই - যেটি প্রয়োজন সেটি সৃষ্টি হয়।

কোর-আন আল্লার বাণী। কিন্তু কোরাণের বিষয়গুলির এবং আদেশগুলির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা বা Spirituality বলতে যা বোঝায় তা কতটা পাওয়া যায় তা পাঠকদের বিবেচ্য। কোর-আন থেকে উদ্ধৃত কিছু কিছু বাণী আল্লাহ্ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা সম্ভব নয়। তবে প্রথম সূরা - সূরা আল ফতিহা - আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। মূল কোরআন খোদার কাছ থেকে পাওয়া প্রার্থনার জবাব মাত্র।

আল্লা আদমকে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন আকারের ওপরই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা ষাট হাত ছিল। যারা বেহেশ্‌তে যাবেন তারা সেই আদিমতম পরিমাণ ষাট হাত বিশিষ্টই হবেন। জাগতিক জীবনে দেহ ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। গাছের ফল যেমন ক্রমশঃ ছোট হয়। (হাদীশ শরীফ - পৃ. ৩০৫ (৭১৬ নং) হরফ প্রকাশনী)

কোর-আন পাঠে জানা যায়, আল্লা অসম্ভব ক্রোধী, ঈর্ষাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর। তাঁকে অস্বীকার করলে নরকে যেতে হবে। সেখানে অনন্তকাল আগুনে দগ্ধ হতে হবে। প্রত্যেকবার দগ্ধ হওয়ার পর নতুন চামড়া সৃষ্টি করেন, যাতে অনন্তকাল ধরে অবিরাম দগ্ধ করা যায়। (সূরা - নিসা আয়ত ৫৬) একমাত্র মুমিন মুসলমানদের প্রতি তার করুণা। তাঁর বান্দারা যদি অমুসলমানদের মামুদ, চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির শাহর অত্যাচারের মত অত্যাচার করে তাহলে আল্লা খুশী হন। সেই বান্দারা ইহলোকে গণিমতের মাল আর পরলোকে স্বর্গের উৎকৃষ্ট স্থানে যাপনের সুযোগ পান।

টীকা - ৪ জান্নাত বা স্বর্গ

আরবী ভাষায় স্বর্গকে জান্নাত্ আর নরককে জাহান্নাম্ বলা হয়। ফার্সী ভাষায় বলা হয় যথাক্রমে বেহস্ত এবং দোজখ। জান্নাতের ৮টি দরজা - খেল্দ, দাবস্ সালাম, দারুল, আদন, নঈম, মাওয়া, অলঅইন, ফেরদৌস। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, সে সব সময় সুখে থাকবে, অমর হবে। তাঁর পোষাক জীর্ণ হবে না, যৌবন লুপ্ত হবে না। নির্মল জল, দুধের, মধুর, সুরায়, ঝর্ণা, বিবিধ ফলমূল, মর্তে মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও স্বর্গে সুরাপান করা যাবে এবং যতই পান করুক মাতাল হবে না। সেখানে অতি সুন্দরী রমণীরা আছেন। জীন বা মানবের মধ্যে কেউ তাদের স্বর্শ করেনি। তাদের সঙ্গে যখনই মিলিত হওয়া যাবে, তখনই তাদের কুমারী অবস্থায় পাওয়া যাবে। এরা সব হুরী। এদের সম্পর্কে কোরাণের অনেক আয়তে বর্ণনা আছে। সূরা ২/আয়ত ২৫, ৪৭/১৫, ৫২/১৯-২৪, ৫৫/৫৮-৭৮, ৫৬/২২-২৮। আবদুল বিন ওমরের মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসী ৫০০ হুরী, ৪০০ কুমারী এবং সহবাস করেছে এমন ৬০০০ রমনী থাকবে। এছাড়াও থাকবে কিশোর দাস (চাকর)

জিহাদকারীরা সরাসরি স্বর্গে যাবে। স্বর্গে তাদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকবে। তাঁদের সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে।

টীকা - ৫ জাহান্নাম বা নরক

স্বর্গের বাঁ পাশে নরকের অবস্থান। মাঝে মাত্র আরাফ পাঁচিলের ব্যবধান। নরকের ৭টি দরজা। সাত রকম পাপীদের জন্য সাতরকম ব্যবস্থা। সব থেকে পাজী হল - কাফের এবং মোনাফেক। কাফের হল তারা যারা মুসলমান হয়নি। আর মোনাফেক হল তারা যারা বাইরে মুসলমানের মত হলেও অন্তরে ইসলাম বিশ্বাস করে না। মুসলমান পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট নরকের নাম - জাহান্নাম্, ঈশীয়দের জন্য নতি, ইহুদীদের জন্য - হোতমা, সামী সম্প্রদায়ের জন্য সয়ির, অগ্নিপূজকদের জন্য সকর, অংশীবাদীদের জন্য জহিম আর মোনাফেক্দের জন্য হাভিয়া। সব নরকেই আগুন। তবে তারতম্য আছে। জাহান্নামের আগুন পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, দাহিকা-শক্তিও কম। এরপর থেকে আগুনের উচ্চতা ও দাহিকা শক্তি বাড়তে থাকবে - হাঁটু পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত, বুক পর্যন্ত, হাভিয়াতে মাথা পর্যন্ত।

টীকা - ৬ কেয়ামত - শেষ বিচারের দিন

পবিত্র কোরাণ গ্রন্থে কেয়ামৎ শব্দটি ৩০০ বার, নরক ২৯৭ বার এবং স্বর্গ ৬৪ বার উল্লিখিথ হয়েছে। কেয়ামত্‌-এর আক্ষরিক অর্থ হল দাঁড়াবার দিন। আরবী কিয়ামাহ্‌ শব্দের অর্থ - দাঁড়ানো। আরবের প্রাক-ইসলামী বিশ্বাস ছিল মৃত্যুতেই শেষ। ইসলামে বলা হল - মৃত্যুই শেষ নয়। পরলোক আছে। আল্লা একদিন কেয়ামত বা শেষ বিচার করবেন। সেই বিচার অনুযায়ী কোন র্স্বগ ও কোন নরক - কার কোনটা হবে তা স্থির হবে। কেয়ামতের দিন সূর্য পশ্চিম দিকে উচিত হবে। শিঙায় ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয় শুরু হবে। মাটির ভিতর থেকে সোনা রূপা সব বেরিয়ে আসবে। মাটির তলা থেকে বিশেষ এক ধরণের পশু বেরিয়ে আসবে - তারা মানুষের মত কথা বলবে। ঐটাই হবে শেষ দিন। তারপর আর দিন জন্মাবে না। সেদিন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকে কবর থেকে তোলা হবে। সবাইকে নগ্ন এবং খাত্‌না বিহীন অবস্থায় তোলা হবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ থাকবে। অবিশ্বাসী কাফেররা হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। সকলের বিচার হবে।

কাফের এবং মোনাফেকদের নরকের আগুনের তেজ পৃথিবীর আগুনের থেকে ৭০ গুণ বেশী হবে। নরকে ৭০ হাজার জঙ্গল থাকবে, যার প্রত্যেক গাছে ৭০ হাজার শাখা প্রশাখা থাকবে। প্রত্যেক শাখায় ৭০ হাজার সাপ এবং ৭০ হাজার বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে থাকবে। ঐ সব সাপ আর বিছে কামড়ালে তার জ্বালা ও ফোলা ৪০ বছর স্থায়ী হবে। ফুটন্ত ধাতুর ৫টি নদী পাপীদের দিকে প্রবাহিত হবে।

শেষ বিচারের দিন নবী মহম্মদ অন্যসব নবীদের থেকে বেশী ক্ষমতাশালী হবেন। সেদিন তিনি তার ৭০ হাজার উম্মত সহ সকলের আগে পৌঁছাবেন। সেদিন হাসরের ময়দানে নবীর উম্মতদের সংখ্যাই বেশী হবে এবং তারাই অর্ধেক জায়গা দখল করে নেবে। (মুসলিম ৪১৮)

কেয়ামত কবে হবে - তার লক্ষণ আগে থেকে দেখা যাবে। জেরুজালেমের অদূরে রিহা পর্বতের পাদদেশে সাহেরা নামক স্থানে যে প্রান্তর আছে সেদিন সবাইকে সেখানে সমবেত করা হবে। আল্লা সেদিন ঐ প্রান্তরকে ৪০টি পৃথিবীর সমান করবেন।

টীকা - ৭ মিল্লাত

ইসলামে যেমন 'জেহাদ' আছে তেমনি আছে - বিশ্বাস, শুদ্ধতা, উপাসনা, ভিক্ষা, উপবাস, তীর্থ, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, কারবার, বানিজ্য, উত্তরাধিকার,

দান, শপথ, অপরাধ, শাস্তি, সরকার, শিকার, খাদ্যাভাস ও খাদ্য, পান, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, অভিবাদন, কাব্য, স্বপ্ন, সদগুণ, অনুতাপ, শেষ দিন প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়। সব দেশের প্রত্যেকটি মুসলমানকে একই বিষয়ে, একই সময়ে একই নিয়ম মেনে চলতে হয়। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, চিন্তা-বিচিন্তা, ইত্যাদির কোন স্থান নাই। দেড় হাজার বছর আগে শেষ চিন্তা ও শেষ নিয়মের ব্যাপার চুকে গেছে। এসব প্রসঙ্গে স্বাধীন চিন্তারও স্থান নাই। অন্য কোন নবী জন্মাবেন না, অন্য কোনও নিয়মও প্রবর্তিত হবে না। যা করার করে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধু বাম-ডান করা ছাড়া অন্য কোন ছন্দ বা পছন্দ - ঈশ্বরদ্রোহিতা।

এই ভাবে যে নিয়মবদ্ধ সমাজ তাকেই বলা হয় মিল্লাত্। একে জেহাদ নীতির সঙ্গে পাশাপাশি রাখলে - একটি নূতন রূপ ও রঙ পাওয়া যায়।

কাউন্ট কেইসার লিঙ্ মুসলিম দেশগুলিতে ভ্রমণ করে Travel Diary of a Philosopher শিরোণামে একটি বই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "Islam is a religion of absolute surrender and submissiveness to God - but to a God of a certain character - a War-Lord who is entitled to do with us as He will and who bids us stand ever in line of battle against the foe .... The ritual of this belief embodies the idea of discipline. When the true believers everyday at fixed hours perform their prayers in ranks in the mosque, all going through the same gestures at the same moment, this is not, as in Hinduism, done in a method of self-realization, but in the spirit in which the prussian soldier defiled before his Kaiser. This military basis of Islam explains all the essential virtues of the Muslims. It also explains his fundamental defects - his unprogressiveness, his incapacity to adapt himself, his lack of invention. The solider has simply to obey orders. All the rest is the affair of Allah.

[Quoted by Sir Jadunath Sarkar in his 'History of Auranzab, Calcutta 1928, Vol. 3, Page 171]

টীকা - ৮ কিবলা

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান যেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেন, তাকে কিব্লা বলে। মক্কার কাবাগৃহ মুসলমানদের কিব্লা। মক্কার অবস্থান ভারতের পশ্চিমে, তাই এদেশে মুসলমানরা পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ করেন। মুসলিম ধর্মীয় জীবনে এই কিব্লার দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। কেউ মারা

গেলে দাফন করার সময় মৃতদেহ উত্তর দিকে মাথা, দক্ষিণ দিকে পা রেখে কিবলামুখী শোয়াতে হবে। এইভাবে শোয়ার পর দোয়া, দরুদ ও জানাজার নামাজ আদায় হবে। কোরবানীর ঈদেও যে কোরবানী করবে তাকে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

ইসলামের শৈশবে জেরুসালেমের মসজিদ আকসা বা বায়তুল্লা মোকাদ্দেশ মুসলমানদের কিবলা ছিল। পরে মদিনা বাস কালে নবী মহম্মদ মক্কার কাবাকে কিবলা করার জন্য আদিষ্ট হন। (সূরা - বাকরা, আয়ত ১৪৪) নামাজের সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বলতে হবে, 'নিশ্চয়ই আমি আশমান-জমিন সৃষ্টিকারীর দিকে মুখ, করলাম এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।'

টীকা - ৯ আজান

'আজান' কথার অর্থ হল নামাজের জন্য আহ্বান। মসজিদ থেকে এই আজান দেওয়া হয়। যিনি আজান দেন তাকে 'মুয়াজ্জীন' বলে। আজানে কী বলা হয়, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। 'বিলাল' নামে এক ব্যক্তি মুসলিম জগতের প্রথম মুয়াজ্জীন। বিলাল ছিলেন ক্রীতদাস। নবী মহম্মদের ধনী বন্ধু আবু বকর বিলালকে কোরেশের কাছ থেকে কিনে নিয়ে তাকে মুক্ত করেন।

টীকা - ১০ কলেমা

কলেমা প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কলেমা হল ইসলামের ছয়টি মূল মন্ত্র। এই ছয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় ঈমান আনা। ছয়টি মন্ত্র হল - কলেমা তৈয়ব, কলেমা শাহাদাৎ, কলেমা তৌহীদ, কলেমা তামজিদ, কলেমা রদ্দে কুফর এবং কলেমা তাহ্‌মীদ।

কলেমা তৈয়ব ঃ 'আল্লা ব্যতীত উপাস্য নাই, মহম্মদ আল্লার রসুল।' (আল্লাহ্‌ এবং তার রসুল মহম্মদকে এক সঙ্গে আনতে হবে। শুধু আল্লাহ্‌র নামে মুসলমান হওয়া যাবে না। কোরাণে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে - আল্লা রসুলে অনুগত হও। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়ত ৩২)। আল্লা ও রসুলকে একসঙ্গে বিশ্বাস না করলে নরকের আগুনে চিরস্থায়ী হতে হবে। (সূরা -জ্বিন, আয়ত ২৩)

লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুল আল্লা (আল্লার সঙ্গে মহম্মদের এই একাসনের বিষয়ে ড. আলি সিনা তার বইতে বলেছেন, Allah is the Personality cult of Muhammad)

কলেমা শাহাদাৎ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লা ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশী নাই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল।

কলেমা তৌহীদ ঃ 'হে আল্লা আপনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই, আপনি অদ্বিতীয় এবং আপনার কোন অংশী নাই। রসুল মহম্মদ ধর্মভীরুগণের নেতা এবং বিশ্ব পালক কর্তৃক প্রেরিত।'

কলেমা তামহীদ ঃ 'হে আল্লা আপনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই, আপনি জোতির্ময় আল্লা, এবং আপনি আপনার জ্যোতির দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। হজরৎ মহম্মদ প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে অগ্রগন্য ও সর্বশেষ নবী।' এই কলেমা বলেই কোরাণ এবং হাদিসের কোন সংশোধন সম্ভব নয়। আর কোন নবী যদি জন্মাবার সম্ভাবনাই খতম্ হয়ে যায় তাহলে সংশোধন বা সংযোজন করার কেউ থাকেন না। তাই কোরাণ - অপরিবর্তনীয়।

(উল্লেখ্য যে, দরবেশ মীর্জা আহম্মদ নামে একজন নবী মহম্মদকে শ্রেষ্ঠ নবী মেনে নিয়েই নিজেকে নবী বলে প্রচার করেন। ফলে সমগ্র আহম্মদী সম্প্রদায়কে অমুসলমান বা কাফের বলে দেগে দেওয়া হয়েছে)

কলেমা রদ্দেকুফ্র ঃ 'হে আল্লা আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন কাউকে আপনার শরীক না করি। আমার জ্ঞানের গোচর ও অগোচর সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং বলছি - আল্লা ভিন্ন উপাস্য নাই এবং মহম্মদ আল্লার প্রেরিত রসুল।'

কলেমা তাহ্মীদ ঃ 'পবিত্র ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে সকল প্রশংসার সাথে স্মরণ করি। তাঁর পবিত্রতা জ্ঞাপন করি এবং আমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

এরপর রয়েছে দুটি বিশ্বাসের শপথ। শপথ বাক্যের একটির নাম - ঈমান মুজমাল, অপরটির নাম - ঈমান মুফচ্ছেল।

ঈমান মুজমাল ঃ 'আমি সর্ববিধ গুণসম্পন্ন আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাঁর আদেশ ও বিধানসমূহ মেনে নিলাম।'

ঈমান মুফাচ্ছল ঃ 'আমি আল্লা, তাঁর ফেরেস্তাগণ, তাঁর কেতাব সকল, তাঁর প্রেরিত রসুলগণ, কেয়ামত, তগদীর এবং মৃত্যুর পর জীবন ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনলাম, বিশ্বাস স্থাপন করলাম।'

আরব দেশের যে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে বিদ্যমান ছিল, সেই আর্থ সামাজিক ও নিষ্করুণ প্রাকৃতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর থেকে নরম, মানবিক ও সামগ্রিক কল্যাণ বিষয়ক কিছু হওয়া সম্ভবতঃ অসম্ভব ছিল।

টীকা - ১১ উর্দুভাষা

The word Urdu is derived from the Turki word - Ordu which meant a military camp (R. C. Mazumder, Vol. 7, P. 623) ভারতবর্ষে মুসলমানরা উর্দুকে তাদের ধর্মীয় ভাষা বলে মনে করেন। মুসলিম লীগ একসময় বলেছিল - হিন্দী হল হিন্দুদের ভাষা। উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসাবে না মেনে নিলে তাদের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। উর্দু নাকি মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা। এর থেকে অসত্য আর কিছু হয় না। অতি সম্প্রতি পঃবঙ্গেও এই দাবী উঠেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মুসলমানদের খুশী রাখার পরিকল্পনার সঙ্গে এটিও গ্রহণ করেছেন। যাইহোক, উর্দু ভাষায় উৎস সম্পর্কে আমাদের একটু জানা দরকার।

কোর-আন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ - আরবী ভাষায় লেখা। যে দেশে ঐ ধর্মের উৎপত্তি এটি সেই দেশেরই ভাষা। মোঘল বাহিনী যারা দিল্লীর আশে পাশে বসতি করেছিল তারা হিন্দী ভাষার ফার্সী রূপ দিয়ে উর্দু ভাষা তৈরী করে। Urdu was Persianised form of Hindi : স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে প্রাত্যহিক যোগাযোগের ফলে এই ভাষার উদ্ভব হয়। মোগল সম্রাটরা বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব তুর্কী অথবা ফার্সীতে কথা বলতেন। খুব বেশী হলে ২০০ বছর হল মুসলমানদের একাংশের মধ্যে স্থানীয় ভাষা হিসাবে উর্দুর ব্যবহার হচ্ছে।

পাকিস্তান রচিত হওয়ার পরও পাকিস্তানভুক্ত রাজ্যগুলি নিজ নিজ ভাষা ব্যবহার করে - বালুচিস্তান - বালুচি ভাষা, সিন্ধু - সিন্ধি ভাষা, পাকিস্তানভুক্ত বাংলাদেশের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া প্রচেষ্টা হলে সেখানে তীব্র ভাষা আন্দোলন হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই জাতীয় ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়।

উর্দু যেমন মুসলমানদেরই একচেটিয়া নয়, হিন্দীও হিন্দুদের একচেটিয়া নয়। বহু হিন্দী ভাষী অতি চমৎকার উর্দু লিখেছেন আবার অনেক উর্দুভাষী অতি সুন্দর - হিন্দী লিখেছেন। হিন্দী ভাষার উৎস্য সংস্কৃত। হিন্দী বর্ণমালা দেবনাগরী হরফে যা সংস্কৃতরও হরফ দেবনাগরী। আর উর্দুর হরফ - আরবী ফাসী, তবে উর্দুকে কোন 'ভাষা' মর্যাদা দেওয়া যায় না। যে কোন ভাষার একটি ব্যাকরণ থাকে এবং ক্রিয়াপদ থাকে। উর্দুর কোন ব্যাকরণ নাই, নিজস্ব ক্রিয়াপদও নাই।

ইংরাজরা আসার পরও ভারতে আদালতের ভাষা ছিল ফার্সী। ইংরাজরা তা মেনেও নেয়। আদালত, মক্কেল, উকিল, আর্জি, জবাব, সওয়াল, ফায়সালা ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত শব্দ গুলি বিচারালয় কেন্দ্রিক ফার্সী শব্দ। কালক্রমে ইংরাজী

ও হিন্দী সরকারী ভাষায় এসে গেল। হিন্দী ভাষীরা আবেদন জানানর ভাষা হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দী চাইল, ফার্সীর পরিবর্তে বা উর্দুর পরিবর্তে। মুসলমানরা বলেছিল - এতে তাদের অপমান করা হয়েছে।

কোন ভাষাই কেবল মনের ভাবই প্রকাশ করে না, এটি সংস্কৃতির একটি অঙ্গ এবং অংশও বটে। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের খাতিরে - রঘুপতি রাঘব রাজারাম গানের মধ্যে গান্ধীজী অনুপ্রবেশ করালেন - ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের খাতিরে রামচন্দ্র হলেন - বাদশা রাম, সীতা দেবী হলেন বেগম সীতা, ভাই লক্ষণ হলেন - সাহাজাদা লক্ষণ, মহামুনি বশিষ্ট বলে গেলেন - মৌলানা বশিষ্ঠ।

সবই মানলাম। প্রশ্ন একটাই - হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

টীকা - ১২ কাওয়ালী

বিশ্বকোষ Vol-8, P. 51

আরবী করবালী শব্দ থেকে বাঙ্গলায় কাওয়ালী শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। সুফী সম্প্রদায়ের ভজন বিশেষ কাওয়ালি নামে পরিচিত। অনেকে খেয়াল এবং কাওয়ালিকে এক করে দেখেন। কিন্তু সদারঙ-এর প্রবর্তিত খেয়ালের সঙ্গে কাওয়ালীর পার্থক্য স্পষ্ট। কাওয়ালী মধ্য লয়ে গাওয়ার রীতি। এতে রাগ কিংবা গানের বিস্তার নাই। গানের সঙ্গেই তাল সন্নিবেশিত। তবে আগের যুগে ছোট ছোট তাল ব্যবহারের রীতি ছিল। আকবরের রাজত্বকালে চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, শেখ বহাউদ্দীন প্রমুখ হালকা চালের গান হিসাবে কাওয়ালী গাইতেন।

ভারতকোষ Vol-II, P. 224

কাওয়ালী আরবী কওল (কথন) শব্দ হইতে উদ্ভুত। সম্ভবতঃ দরবেশদের গান বাজনা হইতে এই সংগীতের সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষে সুলতানী আমলে ইহা কাব্য সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়। কথিত আছে, আমীর খসরু ইহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি করেন।

ইহাতে বিভিন্ন পারসিক ছন্দের গীতি ও মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া কাব্যের আবৃত্তি করা হইত। বর্তমানে কেবল উর্দু গীত ও কবিতার ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কবি গানের মত দুই দলে উত্তর প্রত্যুত্তরও এই গানের বৈশিষ্ট্য। সংগত হিসাবে ডফ্ ও ঢোলের ব্যবহার হয়। কাওয়ালী গায়ককে কাওয়াল বলে।

ঋণ স্বীকার ঃ

যাঁদের পুস্তকাদি ব্যতীত এই প্রসঙ্গে কলমপাত করা যেত না, তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিছু কিছু পুস্তকের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রবন্ধের মধ্যে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় সেগুলি উল্লিখিত না হলেও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা একইভাবে থাকল। — লেখক

1. Indian Muslims : Who are they by K. S. Lal (Voice of India 2/18 Ansari Road, New Delhi - 110002)
2. Chachnama translation in H.M. Elliot and J. Dowson, History of India as told by its own Historians in 8 Vols. Low Price Publications, A/6, Nimri Commercial Centre, Near Ashok Vihar, Phase-IV, Delhi - 110052.
3. Al Biladuri, Futuh-ul-Buldan Trans E & D Ref. 2 in this list.
4. History of India as told by its own Historians (E & D hereafter) 8 Vols.
5. Feristha : Tarique-i-Feristha as in E & D
6. Kitab-i-Yamini by Alutbi Trans. H & D
7. B. P. Mazumder - The Socio Economic History of Northern India, Calcutta 1960.
8. Cambridge History of India.
9. Taz-ul-Masur - Trans. H & D.
10. Titus : Islam in India and Pakisthan Calcutta - 1959.
11. K. S. Lal : Growth of Muslim Population, Delhi.
12. Minhaj-us-Siraj : Tabaqat-i-Nasiri Trans. E & D
13. Ziauddin Barani : Tarik-i-Firoz Sahi
14. K. S. Lal - Twilight of Sultanate
15. Alberuni
16. M. Muzeeb - The Indian Muslims (London) 1976.
17. R. C. Mazumder : Study of Indian History article in Asiatic Society (Bombay)
18. K. S. Lal : Growth of Muslim Population

19. Feristha : Tabaqat-i-Akbari, Dr. U. N. Dey
20. **Barbosa** : **The book of Duarte Barbosa** (quoted by K. S. Lal)
21. Hughes : Dictionary of Islam
22. Hughes : Dictionary of Islam
23. Akbar Nama : Trans. H. Beveridge
24. Mannucci : Storia do Mogor (quoted)
25. Sharma : Conversion and Reconversion to Hinduism
26. Manrique : Travels of Frey Sebastian Manrique (quoted)
27. Mulfuzat-i-Timari (Trans. E & D Vol-3)
28. Baburnama - Trans. A. S. Beveridge (quoted)
29. Aziz Ahamed : Studies in Islamic culture in the Indian Environment (Oxford, 1964)
30. Davis Kingslay : The Population of India and Pakisthan (1951)
31. ভারতকোষ ঃ (১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
32. A. L. Basham : The wonder that was India
33. S. A. A. Rizvi - The wonder that was India Part-II
34. Koenraad Elst : Negationism in India
35. অমলেশ মিশ্র ঃ ভারতবর্ষ বনাম ইণ্ডিয়া
36. অমলেশ মিশ্র ঃ ভারতীয় সংস্কৃতি কি মিশ্র সংস্কৃতি ?
37. পরিকথা ঃ সপ্তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে, ২০০৫
39. অমিত দাশ - হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা - ৭৩
39. অমিত দাশ - দুষ্টবুদ্ধি বুদ্ধিজীবী .... অরুণ ঘোষ, ঐ
40. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় - একটি অকপট জীবনী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, অমৃতশরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা - ১২৬
41. জীবন মুখোপাধ্যায় - স্বদেশ পরিচয় - নবভারতী প্রকাশনী, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৯
42. R. C. Mazumder : Editted : The History and Culture of the Indian People, Vol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11.
43. Jawaharlal Nehru : The Discovery of India
44. The Myth of composte culture - Harsh Narain
45. Essential Unity of All Religions : Bhagwan Das

46. Heroic Hindu Resistance to Muslim Invaders : Sitaram Goel
47. Perversion of India's Political Parlance : Sitaram Goel
48. Psychology of Prophetism : Koenraad Elst.
49. ইসলাম ও বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ ঃ ড. নজরুল ইসলাম
50. বিশ্বনবী ঃ গোলাম মোস্তাফা
51. Demogaphic Aggression Against India : Baljit Rai
52. ফৌজদারী কার্য্যবিধি ১৯৭৩ ঃ বাসুদেব গাঙ্গুলী
53. Indian Penal Code Vol.-I : Sarkar
54. A. P. Joshi, M. D. Srinivas, J. K. Bajaj : Religious Demography of India
55. The Holy Bible
56. মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ঃ তরজমা-এ-কুরআন মজীদ।
57. সহীহ্ আল বুখারী - ৬ খন্ড আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
58. আল্লামা জলীল আহসান নাদভী - পথের সম্বল
59. হাদীশ শরীফ - হরফ প্রকাশনী
60. মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ঃ ইসলাম পরিচিতি
61. ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ঃ ইসলাম ধর্মতত্ত্ব
62. P. N. Oak : Islamic Havoc in India History
63. Anwar Shaikh : Islam the Arab Imperialism
64. Anwar Shaikh : This is Jehad
65. Anwar Shaikh : Islam and Human Rights।
66. Dr. Alisina : Understanding Muhammad
67. The Calcutta Quran Petition : Court Documents
68. Ram Swarup : Understanding Islam through Hadis
69. D. S. Margoliouth : Mohammed and The Rise of Islam.
70. The Tragic Partition of India - H. V. Seshadri
71. Jinnah India-Partition Independence - Jaswant Singh
72. The Story of My experience with Truth : M. K. Gandhi.